মৃন্ময়ী

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

১. মইনু মিয়া 2

২. প্রথম ক্লাস 39

৩. রাত দেড়টা বাজে 70

৪. বিব্রতকর পরিস্থিতি 90

৫. ভাইয়া 119

৬. আফাগো আফা 147

৭. আকাশে মেঘ করেছে 161

১. মইনু মিয়া

আমার বাবার নাম মইনু মিয়া। খুবই হাস্যকর নাম। কাঠ মিস্ত্রি বা দরজিদের এরকম নাম থাকে। আমার দাদাজান দরজি ছিলেন, এবং তিনি তাঁর মতো করেই ছেলের নাম রেখেছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি, তার ছেলে গিরায় হিসাব না করে, নেনোমিটার, পিকো সেকেন্ডে হিসাব করবে। আমার বাবা মইনু মিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে জীবন শুরু করবেন।

এখন অবশ্য তার নাম মাইন খান। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময়ই তিনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেভিট করে নাম বদলেছেন। তবে তাঁর রক্তে দরজির যে ব্যাপারটা পৈতৃক সূত্রে চলে এসেছে তা এখনো আছে। আমার বাবা মাইন খান বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে গার্মেন্টসের কারখানা দিয়েছেন। গার্মেন্টসের নাম মৃন্ময়ী এ্যাপারোস। মৃন্ময়ী আমার নাম। ভালো নাম মৃন্ময়ী, ডাক নাম মৃ। আমার ভাবতে খুবই খারাপ লাগে যে, বিদেশী লোকজন বাবার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির শর্ট গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ঘাড়ের সঙ্গে যে স্টিকার লেগে আছে সেখানে লেখা মৃন্ময়ী। অচেনা মানুষের গায়ের ঘামের গন্ধে আমাকে বাস করতে হচ্ছে।

বাবা যেমন ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে উঠে এফিডেভিট করে তাঁর নাম বদল করেছেন, আমি নিজেও তাই করব। অন্য কোনো নাম ঠিক করব, যে নাম কেউ ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াবে না। আমি মনে মনে নাম খুঁজে বেড়াচ্ছি। বাবাকেও একদিন বললাম, বাবা, আমাকে সুন্দর একটা নাম দেখে দাও তো। আমি ঠিক করেছি নাম বদলাব।

বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, মৃন্ময়ী তো খুবই সুন্দর নাম।

নামটায় ঘামের গন্ধ বাবা।

ঘামের গন্ধ মানে কী? বুঝিয়ে বলতো। তোর সব কথা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার নেই।

পরে একসময় বুঝিয়ে বলব। আজ না।

না এখনই বল। মৃন্ময়ীর সঙ্গে ঘামের সম্পর্ক কী?

বাবা চোখ থেকে চশমা খুলে তাকিয়ে রইলেন। খুব অবাক হলে তিনি এই কাজটা করেন। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলেন। আমার ধারণা তিনি এই কাজটা করেন যাতে অন্যরা তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি দেখতে পায়।

আমার বাবা খুবই বুদ্ধিমান একজন মানুষ। এক থেকে দশের মধ্যে যদি বুদ্ধির স্কেল করা হয় সেই স্কেলে বাবার বুদ্ধি হবে ১৩, দশের চেয়েও তিন বেশি। বাবাকে বিচার করতে হলে স্কেলের বাইরে যেতে হবে। এটা তিনি নিজে ভালো করে জানেন। তার মধ্যে সূক্ষ্ম একটা চেষ্টা থাকে যেন অন্যরাও ব্যাপারটা চট করে ধরে ফেলে।

মাঝে মাঝে অতিরিক্ত বুদ্ধিমান মানুষকে বোকা বোকা লাগে। বাবাকে আজ সে রকমই লাগছে। তিনি গা দুলিয়ে হাসার চেষ্টা করছেন। হাসিটা মনে হচ্ছে ঠোট থেকে নেমে এসে শূন্যে ঝুলছে। এই হাসির আমি নাম দিয়েছি ঝুলন্ত মাকড়সা হাসি। মাকড়সা যেমন সুতা ধরে নিচে নামতে থাকে, আবার ওপরে ওঠে, আবার খানিকটা নিচে নেমে যায় এই হাসিও

সে রকম। মাঝে মাঝে হাসি উঠছে, মাঝে মাঝে নামছে। ব্যাপারটা বাবাও বুঝতে পারছেন। তারপরেও এই বোকা হাসি থেকে বের হতে পারছেন না। আমার ধারণা তিনি নিজের ওপর খানিকটা রেগেও গেছেন। মনের ভেতর চাপা রাগ, মুখে নকল ঝুলন্ত-মাকড়সা হাসি সব মিলিয়ে খিচুড়ি অবস্থা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক মৃন্ময়ী এ্যাপারেলসের এমডি মাইন খান সাহেবকে দেখে আমার খানিকটা মায়াই লাগছে।

বাবার ভেতর এই খিচুড়ি অবস্থা তৈরি করেছেন তার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আজহার উদ্দিন। প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি একজন মানুষ। অতিরিক্ত রোগা। লম্বা এবং রোগা মানুষরা সাধারণত খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটেন। ইনি হাঁটেন বুক টান করে। হাঁটা অবস্থায় তাকে দেখলে মনে হবে একটা সরল রেখা হেঁটে চলে যাচ্ছে। তার ঘাড়েও খানিকটা সমস্যা আছে। তিনি ঘাড় কাত করে পাশের জনকে দেখতে পারেন না। তাকে পুরো শরীর ঘোরাতে হয়। তখন তাঁকে আর মানুষ মনে হয় না। মনে হয় রোবট সিগন্যাল পেয়ে ঘুরছে।

আজহার চাচা নানান ধরনের ব্যবসা করেন। সেইসব ব্যবসার প্রায় সবই দুনম্বরী। বাড়ায় তার একটা কারখানা আছে, সেখানে নকল শ্যাম্পু তৈরি হয়। এবং বিদেশী বোতলে ভর্তি হয়ে বাজারে বিক্রি হয়। একবার তিনি টেলিফোন করে আমাকে বললেন, মৃন্ময়ী মা শোনো, ইংল্যান্ডের একটা শ্যাম্পু আছে পেনটিন না কী যেন নাম। ঐটা কিনবে না।

আমি বললাম, কেন আপনার কারখানায় তৈরি হচ্ছে?

আজহার চাচা বিরক্ত হয়ে বললেন, এত কথার দরকার কী? কিনতে না করেছি কিনবে না।

আজহার চাচী গোপন পথে চালনা পোর্টে বিদেশী সিগারেট আনেন। মদ আনেন। তিনি নিজে মদ সিগারেট কিছুই খান না। অতি আল্লাহ ভক্ত মানুষ। রমজান মাস ছাড়াও প্রতি মাসে তিন চার দিন রোজা থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে শরীর নষ্ট হয়ে গেলে রোজা থাকতে পারবেন না। এই কারণেই আগে ভাগে রোজা রেখে ফেলা। তবে বাবার জন্যে প্যাকেট করে বোতল প্রায়ই নিয়ে আসেন। আমাদের ঘর ভর্তি হয়ে গেছে নানান সাইজের বোতলে। এর অনেকগুলোতে পানি ভরে মানিপ্লান্ট লাগানো হয়েছে। বিদেশী মদের বোতলে মানিপ্লান্ট খুব ভালো হয়।

আজহার চাচা উমরা হজ করতে গিয়েছিলেন মক্কা শরীফ। সেখান থেকে বাবার জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছেন। উপহারের প্যাকেট হাতে নেবার পর থেকেই আমার বুদ্ধিমান বাবা বোকার হাসি হাসছেন। তার চোখ মুখও কেমন যেন বদলে গেছে। উপহারটা হলো কাফনের কাপড়।

আজহার চাচা বাবার দিকে তাকিয়ে খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, নবীজীর কবর মোবারক ছোয়ায়ে এনেছি। তিন সেট আনলাম আমার জন্য একসেট, আমার শ্বশুর সাহেবের জন্যে একসেট আর তোমার জন্যে একসেট।

বাবা বললেন, ভালো করেছ। অতি উত্তম করেছ।

আজহার চাচা বললেন, ধর্মকর্মের দিকে তোমার টান তো সামান্য কম, এইজন্যে ইচ্ছা করেই কাফনের কাপড়টা আনলাম। চোখের সামনে এই জিনিস থাকলে কালের চিন্তা

মাথায় আসে। তাছাড়া চলে যাবার সময় তো আমাদের হয়েই গেছে। তোমার কত চলছে ফিফটি টু না থ্রি?

টু।

তাহলে তো খবর হয়ে গেছে। সিগনাল ডাউন। আজরাইলকে নিয়ে ট্রেন রওনা দিয়েছে। মেল ট্রেন, পথে থামবে না।

বাবা শুকনা গলায় বললেন, ঠিক বলেছ।

আজহার চাচা বললেন, কাপড়টা পছন্দ হয় কি-না দেখ। সাধারণ মার্কিন লং ক্লথ না। হাইকোয়ালিটি পপলিন। সৌদি রাজপরিবারের সবার এই কাপড়ের কাফন হয়। খোঁজ-খবর নিয়ে কিনেছি।

মনে হয় অনেক ঝামেলা করেছ।

পছন্দ হয়েছে কি-না বল। এইসব গিফট সবাই আবার সহজে নিতে পারে না। আমার শ্বশুর সাহেব তো খুবই রাগ করলেন। আমাকে কিছু বলেন নি। আমার শাশুড়ি আম্মার সঙ্গে গজগজ করেছেন। তুমি আবার রাগ করো নি তো?

বাবা গা দুলিয়ে নকল হাসি হাসতে হাসতে বললেন, রাগ করার কী আছে? তার মুখের হাসি আরো ঝুলে গেল। আজহার চাচা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মা মৃন্ময়ী, তোমার জন্যেও সামান্য উপহার আছে। মক্কার মিষ্টি তেতুল আর একটা তসবি।

আমি বললাম, থ্যাংক ইউ চাচা।

তসবির গুটিগুলা প্লাস্টিকের না, আকিক পাথরের। তুমি জান কি-না জানি না, আকিক পাথর হলো আমাদের নবীজীর খুব পছন্দের পাথর। পবিত্র কোরান মজিদেও আকিক পাথরের উল্লেখ আছে। তেতুল একটু খেয়ে দেখে তো মা। চিনির মতো মিষ্টি। এক বোতল জমজমের পানিও এনেছি। ভালো জায়গায় তুলে রাখে। অসুখ-বিসুখ হলে চায়ের চামচে এক চামচ খাবে। তবে খেতে হবে। খুবই আদবের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবে না। বসে খাবে, এবং বিসমিল্লাহ্ বলে খাবে। ভালো কথা নাপাঁক অবস্থায় খাবে না।

আমি বললাম, আপনি কি চা খাবেন চাচা? আপনার তো মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে। আদা দিয়ে এক কাপ চা নিয়ে আসি।

নিয়ে আয় এক কাপ চা। সন্ধ্যার পর চা খেলে আমার অবশ্য ঘুমের সমস্যা হয়। ঠিক আছে তুই যখন বলছিস তুই তো জানিস না মা, তোকে অত্যন্ত পছন্দ করি। নবীজীর রওজা মোরকে যে কয়জনের জন্যে দোয়া করেছি তুই আছিস তাদের মধ্যে। চা নিয়ে আয়, খেয়ে বিদায় হই।

আজহার চাচা একটু আগে আমাকে তুমি তুমি করে বলছিলেন। এখন দুই তুই করছেন। এর মানে হলে তিনি এখন আমার প্রতি খুবই মমতা পপাষণ করছেন। বাবাকেও মাঝে মাঝে তিনি তুই বলার চেষ্টা করেন। বাবা পাত্তা দেন না।

আমি বললাম, রাতে খেয়ে যান না চাচা। আপনার প্রিয় তরকারি রান্না হয়েছে।

আজহার চাচা অবাক হয়ে বললেন, আমার যে প্রিয় তরকারি আছে তাইতো জানি না। আমার প্রিয় তরকারি কী?

ছোট মাছ দিয়ে সজনী।

তুই মনে করে বসে আছিস? আশ্চর্য কাণ্ড! কবে তোক বলেছিলাম, আমার নিজেরই তো মনে নাই। মাইন দেখেছ তোমার এই মেয়ে তো বড়ই আশ্চর্য! আচ্ছা ঠিক আছে, রাতের খানা খেয়েই যাই।

বাবা বিরক্ত মুখে তাকাচ্ছেন। আজহার চাচার রাতে ভাত খাবার জন্যে থেকে যাবার ব্যাপারটা তিনি পছন্দ করছেন না। বুদ্ধিমান মানুষ অল্প বুদ্ধির মানুষদের সঙ্গ পছন্দ করে না। অল্প বুদ্ধির মানুষদেরকে দিয়ে অনেক কাজ আদায় করা যায় বলেই তাদের সহ্য করা হয়। ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াবার জন্যে। এক সময় আজহার চাচার বুদ্ধি পরামর্শ এবং অর্থের বাবার প্রয়োজন ছিল। এখন প্রয়োজন নেই। আজহার চাচা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। তাঁর হয়তো ধারণা হয়েছে বাবা তার হজের গল্প খুবই আগ্রহ নিয়ে শুনছেন। বাবার চোখে মুখে মোটা দাগের বিরক্তি কিছুই আজহার চাচার চোখে পড়ছে না। তিনি বাবার দিকে ঝুঁকে এসে হজের গল্প শুরু করলেন

কাবা তোয়াফের সময় কী ঘটনা ঘটেছে শোনো। আমার পাশাপাশি হাঁটছে এক আফ্রিকান মহিলা। চার পাঁচ মণ ওজন। হাতির মতো থপথপ শব্দ করে হাঁটে। পায়ের ওপর পাড়া দেয়। কনুই দিয়ে তা দেয়, পিঠে ধাক্কা দেয়। আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তো আমি মেয়েছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি না। এমন বিপদে পড়লাম! দোয়া টোয়া সব ভুলে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে দেখি এই মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকা করে বলল, ছেরেং

ছেরেং। একটু পর পর বলে, বলে আর মুখ বাঁকা করে হাসে। ছেরেং মানে কী জানি না নিশ্চয়ই কোনো গালাগালি। মই তুমি কি ছেরেং শব্দের মানে জানো?

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, ইদ্দিস ভাষায় ছেরেং মানে হলো সরু, যেমন ধর ছেরেং গা। গা হলো নদী। ছেরেং গা হলো সরু নদী। তোমার রোগা পাতলা চেহারা দেখে রসিকতা করছিল।

চিন্তা করো অবস্থা— কাবা ঘরে এসে ঠাট্টা মশকরা শুরু করেছে। কাবা শরীফের কাছে এসে মানুষ আল্লাহ্ ভয়ে ভীত হয়— আমি এক মেয়েছেলের ভয়ে ভীত হয়ে গেলাম।

বাবা বললেন, ভীত হওয়ার কী আছে?

আজহার চাচা বললেন, তুমি কিছু জানো না বলে এমন কথা বলতে পারলে। এই মহিলা যদি একবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত, তাহলে আর আমাকে উঠতে হতো না। হাজার হাজার হাজি আমার গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যেত ইনস্টেন্ট ডেথ। বহু মানুষ এইভাবে মারা গেছে। যাই হোক, ঐ মহিলাকে কীভাবে শায়েস্তা করেছি শোনো। ভুল বললাম শায়েস্তা আমি করি নাই। আমাকে কিছু করতে হয় নাই। ব্যবস্থা আল্লাহপাকই নিয়েছেন। আমি

উসিলা মাত্র। সেই ঘটনাও বিস্ময়কর।

আজহার চাচা এই পর্যন্ত বলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মা, তুই এখন একটু অন্য ঘরে যা। গল্পের এই অংশটা তোর শোনা ঠিক না।

আমি বললাম, অশ্লীল না-কি চাচা?

শ্লীল-অশ্লীল কিছু না। সব গল্প সবার জন্যে না। মা তুই যাতত। আমাকে। আদা চা খাওয়াবি বললি – আদা চা কই?

আমি বললাম, স্টোরীর আসল মজার জায়গাটা না শুনে আমি নড়ব না চাচা। আমি একটা আন্দাজ করেছি। দেখি আন্দাজটা মেলে কি-না।

মৃন্ময়ী মা, যা রান্নাঘরে যা।

আমি রান্নাঘরে চলে এলাম। রান্নাঘরে মা নিচু গলায় আমাদের বুয়া তস্তুরী বেগমকে শায়েস্তা করছেন। তস্তুরী কী অপরাধ করেছে বোঝা যাচ্ছে না। মায়ের শাসানি শুনে মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু করেছে, যদিও তস্তুরী বেগমের ভয়ঙ্কর কোনো অপরাধ করার ক্ষমতাই নেই। সবচে বড় অপরাধ যা সে নিয়মিত করে তা হলো তরকারিতে লবণ বেশি দিয়ে দেয়। তারপর সেই লবণ কমানোর জন্যে কাঠকয়লা দেয়। লবণের তাতে কোনো উনিশ বিশ হয় না। খেতে বসে কৈ মাছের সঙ্গে এক টুকরো কয়লা উঠে আসে। মা আমাকে দেখে বিরক্ত মুখে বললেন, মওলানা গিয়েছে?

আমি বললাম, যান নি।

এখনো যায় নি, মানে কী? ছয়টার সময় এসেছে, এখন বাজে আটটা। বাড়িতে গিয়ে এশার নামাজ পড়বে না? মানুষ এমন বেআক্কেল হয় কীভাবে? আর কতক্ষণ থাকবে?

আরো ঘণ্টা দুই থাকবেন। তুমি দেখা করে এসোনা। আমি কেন দেখা করব?

দেখা করলেই উপহার পাবে। উনি সবার জন্যে উপহার নিয়ে এসেছেন। আমার জন্যে এনেছেন আকিক পাথরের তসবি। আরবের মিষ্টি তেতুল।

তোর বাবার জন্যে কী এনেছে?

বাবার জন্যে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এনেছেন। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এমন জিনিস। বাবা যা খুশি হয়েছেন। আনন্দে ঝলমল করছেন। উপহার কোলে নিয়ে বসে আছেন। আর দাঁত বের করে আসছেন।

মা উত্তেজিত গলায় বললেন, কার্পেট না-কি? ওখানে খুব ভালো পিরশিয়ান কার্পেট পাওয়া যায়। আমার বান্ধবী রীতা হজ করতে গিয়ে একটা বেড় সাইড কার্পেট এনেছিল। কী যে সুন্দর। উপহার, গিফট এই জাতীয় শব্দগুলি শুনলেই মা কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

আমি বললাম, কার্পেট না। অন্য কিছু। সেটা কী?

পাঁচটা প্রশ্ন করে বের করে নাও হিন্ট দিচ্ছি। এটি একটি পরিধেয় বস্ত্র তবে যে পরিধান করে সে এই বস্ত্র চোখে দেখতে পারে না।

এত কথা পেঁচাচ্ছিস কেন? জিনিসটা কী বল।

জিনিসটা দেখে তোমার চোখ যদি কপালে না উঠে যায় তাহলে আমি ফার্স্ট ক্লাস মেজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেভিট করিয়ে আমার নাম বদলে ফেলব। মৃন্ময়ীর বদলে নাম হবে ঘৃন্ময়ী। আমার ডাক নাম তখন মৃ থাকবে না, ডাকনাম হবে ঘৃ।

এত কথা বলিস না তো।

মা কৌতূহল সামলাতে পারছেন না—বসার ঘরের দিকে রওনা হলেন। আমি বললাম, সদ্য হজফেরত মানুষের কাছে যা— স্লীভলেস ব্লাউজ পরে যাওয়া কি ঠিক হবে?

মা রাগী গলায় বললেন, পাগলের মতো কথা বলছিস কেন? এটা স্পীভলেস ব্লাউজ?

হাতা বেশি ছোট তো, এইজন্যেই বললাম।

তোর বাবার সঙ্গে তো তুই এত ফাজলামি করিস না। আমার সঙ্গে কেন করিস? আমি তোর বান্ধবীও না, বয়ফ্রেন্ডও না।

আমি মিষ্টি করে হাসলাম। কেউ যখন হাসে সে বুঝতে পারে না তাঁর হাসি কেমন হচ্ছে। আমি বুঝতে পারি। কারণ আমি আমার সব হাসি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন দেখেছি। এখনো সময় পেলে দেখি। কোন হাসিতে আমাকে কেমন দেখায়, তা আমি জানি। আমি মোটামুটি পাঁচ ক্যাটাগরীর হাসি রপ্ত করেছি।

১. Non commital হাসি। এই হাসিতে কিছুই বোঝা যাবে না।

২. দুঃখময় হাসি। মন কষ্টে ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু মুখে হাসি।

৩. বিরক্ত হাসি। অন্যের বোকামি দেখে বিরক্তির হাসি।

৪. আনন্দের হাসি। এই হাসি খুব সাধারণ। কোনো বিশেষত্ব নেই।

৫. মোনালিসা হাসি। বিশেষ কারোর জন্যে।

মা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তস্তুরী বেগম বলল, আফা কতবেলের ভর্তা খাইবেন?

আমি বললাম, না।

দিন দশেক আগে একবার কতবেলের ভর্তা খেয়ে বলেছিলাম, বাহ্ খেতে চমৎকার তো! এরপর থেকে রোজই সে দুতিনবার জিজ্ঞেস করে, আফা কতবেলের ভর্তা খাইবেন?

তস্তুরী বেগম আজ রাতের খাবার কী?

ইলিশ মাছের ডিমের ভাজি। ইলিশ মাছ আর পটলের তরকারি। ইলিশ মাছের মাথা আর কাটাকুটা দিয়া লাউ।

ইলিশে ইলিশে দেখি ধূল পরিমাণ। ইলিশের একই অঙ্গে এত রূপ? সজনে দিয়ে ছোট মাছের কোনো তরকারি রান্না হয় নি?

জে না।

রান্না করা যাবে না?

ফিরিজে ছোট মাছ আছে, কিন্তুক সইজনা নাই।

সজনে আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তুমি অতি দ্রুত ছোট মাছের তরকারি রান্নার ব্যবস্থা কর।

জে আচ্ছা।

তোমার জন্যে একটা উপহার আছে। আকিক পাথরের তসবি। মক্কা শরীফের জিনিস এই নাও।

এখন নিতে পারব না আফা, অজু নাই।

টেবিলের ওপর রেখে দিচ্ছি, অজু করে এসে এক সময় নিয়ে যে।

তস্তুরী বেগম আনন্দিত মুখে ঘাড় কাত করল। আমার পরিচিত খুব কম মানুষকেই আমি পছন্দ করি তস্তুরী বেগম সেই অতি অল্প সংখ্যক মানুষের একজন। তার মধ্যে মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। সে যখন আমার সঙ্গে কথা বলে। তখন মনে হয় মা তার ছোট মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়ের প্রতিটি আব্দার শুনে মজা পাচ্ছে। আবার তস্তুরী বেগম যখন আমার মার সঙ্গে কথা বলে তখন মনে হয় সে তার রাগী বড় মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। বড় মেয়ে অন্যায়ভাবে কথা বলছে তা সে বুঝতে পারছে। বুঝতে পারলেও কী আর করা হাজার হলেও মেয়ে।

সজনে ডাঁটার কী ব্যবস্থা করা যায় অতি দ্রুত ভাবার চেষ্টা করছি। ভাইয়া বাসায় থাকলে কোনো সমস্যা নেই যেখান থেকে হোক সে সজনে ডাঁটা জোগাড় করবে। কাঁচাবাজার বন্ধ থাকলে কোনো সজনে গাছের খোঁজ বের করে, গাছ থেকে পেড়ে আনবে।

মুশকিল হলো এই সময়ে ভাইয়ার বাসায় থাকার কোনোই কারণ নেই। রাত বাজে মাত্র আটটা।

ভাইয়া এখন কী একটা কম্পিউটার কোর্স নিচ্ছে। বাংলাদেশ একেক সময় একেক দিকে ঝুঁকে পড়ে। এখন ঝুঁকেছে ইউনিভার্সিটি এবং কম্পিউটারের দিকে। পাড়ায় পাড়ায় ইউনিভার্সিটি। দুতলা বাড়ি। দুতলায় ইউনিভার্সিটি ক্লাস, এক তলায় এডমিনস্ট্রেটিভ বিল্ডিং। গ্যারেজে ভাইস চ্যান্সেলার সাহেবের অফিস। সেই ঘরে রং জ্বলে যাওয়া কার্পেট আছে। ঘড়ঘড় শব্দ হয় এমন এসি আছে। এসিতে গ্যাস নেই। বাতাস ঠাণ্ডা হয় না। একটা এসি চলছে, বিকট শব্দ হচ্ছে। এটাই যথেষ্ট। ভাইস চ্যান্সেলার সাহেবের ইজ্জত তো রক্ষা হচ্ছে।

একইভাবে শুরু হয়েছে কম্পিউটারের দোকান। যে দোকানের নাম আগে ছিল দিলখোশ চটপটি হাউস, এখন তার নাম DIL Dot.com Computer Heaven.

ভাইয়া যে কম্পিউটার কোম্পানিতে কাজ শিখছে সেই কোম্পানির নাম International Net. কোর্স শেষ হবার পর এই কোম্পানি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব ছাত্রকে বিদেশে চাকরি যোগাড় করে দেবে। এই কোম্পানির ক্লাশ দুই ব্যাচে হয়। সেকেন্ড ব্যাচের ক্লাস শুরু হয় রাত আটটার পর। ভাইয়ার ফিরতে ফিরতে রাত বারটা একটা বাজে। আগে খাবার টেবিলে তার ভাত ঢাকা দেওয়া থাকত। সে ঠাণ্ডা কড়কড়া ভাত খেয়ে নিঃশব্দে

শুয়ে পড়ত। অন্যদের ডিসটার্ব হবে এইজন্যে খাবার ঘরের বাতি পর্যন্ত জ্বালত না। বারান্দার বাতির আলো তার জন্যে যথেষ্ট। ভাত খেয়ে এটো থালাবাসন যে টেবিলে রেখে দিত তা না। সব কিছু ধুয়ে মুছে মিটসেকে তুলে রেখে যেত যাতে বাবা সকালে ঘুম থেকে উঠে বুঝতে না পারেন রাতে কেউ খেয়েছে। গত বুধবার থেকে বাবার হুকুমে টেবিলে ভাত রাখা বন্ধ হয়েছে। বাবা কঠিন গলায় বলেছেন, ভদ্রলোকের বাড়িতে একটা সিস্টেম থাকবে। রাত দুটার সময় বাড়ির বড় ছেলে একা একা ভাত খাবে এসব কী? এটা কি পাইস হোটেল? রাত এগারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরলে খাবার আছে। এগারোটার পরে কেউ যদি আসে তাকে বাইরে থেকে খেয়ে আসতে হবে। ফ্রীজ খুলে এটা সেটা যে খেয়ে ফেলবে তাও হবে না। ফ্রীজ খোলা যাবে না। এই হুকুম আমার জন্যেও প্রযোজ্য। আমি রাত এগারোটার মধ্যে না ফিরলে আমার জন্যেও খাবার থাকবে না।

ভাগ্য ভালো ভাইয়া তার ঘরে। দরজা খোলা, বাতি নিভিয়ে সে শুয়ে আছে। আমি ঘরে ঢুকতে সে বলল, বাতি জ্বালাবি না খবরদার।

বাতি নিয়ে ভাইয়ার কিছু সমস্যা আছে। ইলেকট্রিকের আলো তার নাকি চোখে লাগে। চোখ কড়কড় করে। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। বেশির ভাগ সময়ই ভাইয়া তার ঘরে বাতি নিভিয়ে রাখে। বারান্দার আলোই না-কি তার জন্যে যথেষ্ট।

আমি বাতি জ্বালালাম। ভাইয়া বিরক্ত মুখে উঠে বসতে বসতে বলল, কী চাস?

আমি সহজ গলায় বললাম, সজনে চাই। ছোট মাছ দিয়ে সজনের তরকারি রান্না হবে। তুমি অতি দ্রুত সজনে কিনে আনবে। এই নাও টাকা। কুড়ি টাকায় হবে না?

শার্ট গায়ে দিতে দিতে ভাইয়া টাকাটা নিল। অন্য যে-কোনো ছেলের সঙ্গে এইখানেই ভাইয়ার তফাত। অন্য যে-কোনো ছেলে বলত, এত রাতে সজনের তরকারি কেন? সজনে এমন কোনো তরকারি না যে রাত দুপুরে খুঁজে এনে রাঁধতে হবে।

ভাইয়াকে কোনো কিছু করতে বললে সে সেই বিষয়ে একটা প্রশ্ন করে না। রাত তিনটার সময় ঘুম ভাঙিয়ে যদি তাকে বলা হয়, দুটা দেশী মুরগির ডিম কিনে আনতে, কোনো প্রশ্ন না করেই সে বের হবে। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ডিম হাতে উপস্থিত হবে। একবারও জিজ্ঞেস করবে না, রাত দুটার সময় ডিমের দরকার কেন?

তোমার আজ কম্পিউটার ক্লাশ নেই।

না।

ছুটি না-কি? কম্পিউটারের ইন্সট্রাক্টারদের কেউ কি মারা গেছে?

না, আমিই ছেড়ে দিয়েছি।

কেন ছেড়ে দিয়েছ?

কম্পিউটার স্ক্রীনের আলো চোখে লাগে। চোখ জ্বালা করে। মাথা দপদপ করে। তা ছাড়া কিছু বুঝিও না। সব কিছু আউল লাগে।

কম্পিউটারের পড়াশোনা তাহলে বাতিল?

হুঁ।

ছয় হাজার টাকা ভর্তি ফি জলে গেল?

হুঁ গেল।

চোখের জন্যে ভালো একজন ডাক্তার দেখাও না কেন? যত দিন যাচ্ছে। তোমার সমস্যাটা মনে হয় বাড়ছে।

ভাইয়া জবাব না দিয়ে বের হয়ে গেল। তার চোখ লাল হয়ে আছে। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। চোখ উঠলে যেমন হয় ঠিক সে রকম অবস্থা।

ভাইয়া আমার আপন ভাই না, সৎ ভাই। আমার বাবা ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়তেন তখন যে মেয়েটিকে প্রাইভেট পড়াতেন তাকে বিয়ে করে ফেলেন। তাদের একটা ছেলে হয় তার নাম রাখা হয় হাসানুল করিম। বাবা পড়াশোনা শেষ করে কী একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে স্ত্রী-পুত্র কেলে ইংল্যান্ড চলে যান।

সেখান থেকেই দু বছরের মাথায় তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দেন। বাবা দেশে ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারের চাকরি পেয়ে যান। আবার বিয়ে করেন। তাদের একটি মেয়ে হয়। মেয়ের নাম রাখা হয় মৃন্ময়ী। আমি সেই মৃন্ময়ী।

আমার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন বার তের বছরের একটা ছেলে সুটকেস, ব্যাগ এবং বইপত্র নিয়ে আমাদের বাসায় থাকতে আসে। বাবা গম্ভীর মুখে সেই ছেলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন এর নাম হাসানুল করিম। ক্লাশ ফাইভে পড়ে। এ আমার ছেলে। আমার প্রথম পক্ষের সন্তান। এখন থেকে এই বাড়িতে থাকবে।

আমার মা চোখ কপালে তুলে হেঁচকির মতো শব্দ করে বললেন, এ-কী! প্রথম পক্ষের সন্তান মানে কী? তুমি কি আরো বিয়ে করেছ না-কি? আমি দ্বিতীয় পক্ষ না তৃতীয় পক্ষ?

বাবা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তুমি দ্বিতীয় পক্ষ।

কী সর্বনাশ! তুমি কি সত্যি আরেকটা বিয়ে করেছিলে?

বাবা বললেন, হ্যাঁ করেছিলাম। সেটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই না। দুর্ঘটনা নিয়ে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তোলার কিছু নেই। তোমার যদি কিছু বলার থাকে ঠাণ্ডা গলায়, লজিক্যালি বলো। আমার একটাই ভুল হয়েছে, ব্যাপারটা তোমাদের জানানো হয় নি। I am sorry for that. এখন জানলে, ফুরিয়ে গেল।

মা বললেন, ফুরিয়ে গেল?

বাবা বললেন, হ্যাঁ ফুরিয়ে গেল। তুমি যদি মনে করে এত বড় অন্যায় যে করেছে তার সঙ্গে বাস করবে না–আমি তাতেও রাজি আছি। My door is open.

মা পুরো ঘটনায় এতই অবাক হলেন যে, চিৎকার চেঁচামেচি হৈচৈ করতে পারলেন না। হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন। আসলে তিনি বোকা টাইপ বলে বুঝতে পারছিলেন না কী করা প্রয়োজন। আমার ধারণা এই ঘটনায় তিনি রাগ বা দুঃখ যতটা পাচ্ছিলেন, মজাও ঠিক ততটাই পাচ্ছিলেন। মা মজা পেতে পছন্দ করেন। বাংলা সিনেমা তিনি খুবই আগ্রহ করে দেখেন। এই প্রথম নিজের জীবনে বাংলা সিনেমা চলে এল। একঘেয়ে জীবনের মধ্যে বড় ধরনের বৈচিত্র্য। খারাপ কী?

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মৃন্ময়ী, একে এক তলার বারান্দাওয়ালা ঘরটায় থাকতে দে। যা, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যা। ও সাথে কী কী এনেছে একটু দেখ। টুথপেস্ট, ব্রাশ না থাকলে জামানকে বল কিনে এনে দিতে। টগর এর ডাক নাম। তুই ভাইয়া ডাকবি। তোর চে বয়সে বড়।

মার মতো আমিও খুবই অবাক হয়েছিলাম। তবে অবাক হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার জন্যে মায়া লাগছিল। কারণ ছেলেটা আসার পর থেকে নিঃশব্দে কাঁদছিল। ফুটফুটে একটা ছেলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কারো দিকে তাকাচ্ছে না। তার শরীর সামান্য কাঁপছে। বাবা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কড়া। গলায় বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? কাঁদবে না। ছেলেটা কান্না বন্ধ করল না। সে এমনভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল যে, চোখের জল নাক বেয়ে শিশিরের ফোটার মতো টপটপ করে পড়ছিল। তারপর কতদিন কেটে গেছে, ভাইয়া এখন কত বড় হয়েছে, এখননা তার দিকে তাকালে শৈশবের দৃশ্যটা মনে পড়ে। আমি স্পষ্ট দেখি তার নাক বেয়ে টপটপ করে চোখের পানি পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে যায়। চোখের সামনে এই দৃশ্যটা ভাসে বলেই ভাইয়া যে বড় হয়েছে এটা আমার

মনে থাকে না। মনে হয় তার বয়স যেন কৈশোরেই থেমে আছে। স্টিল ছবির মতো। ছবির মানুষের বয়স বাড়ে না।

রাত বারোটার মতো বাজে।

আমি আমার ঘরের বারান্দায় বসে আছি। পুরো বাড়িতে শুধু এই জায়গাটা আমার নিজের। এখানে কারোর ঢোকার অনুমতি নেই। আমার শোবার ঘরে যে। কেউ আসতে পারে। কিন্তু বারান্দায় না। রেলিং-এর পাশে দুটা ফুলের টবে অপরাজিতা গাছের চারা লাগিয়েছিলাম। শুরুতে চারা দুটির অবস্থা জন্ডিসের রোগীর মতো ছিল, এখন অবস্থা ভিন্ন। বারান্দার রেলিং গাছে ছেয়ে গেছে। অপরাজিতা ফুল যে এত সুন্দর তাও আমার জানা ছিল না। বারান্দায় যখন বসি তখন মনে হয় নির্জন কোনো পার্কের অপরাজিতার বনে বসে আছি। আমাকে ঘিরে ফুলের উৎসব হচ্ছে। ঘুমুতে যাবার আগে আমি কিছুক্ষণ এই বারান্দায় বসি।

অপরাজিতা ফুলের কোনো গন্ধ নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো বারান্দায় যখন বসি তখন অপরাজিতা ফুলের গন্ধ পাই। গন্ধটা অদ্ভুত বেলী ফুলের সঙ্গে লেবু পাতা কচলালে হয়তো এ রকম গন্ধ হয়। ঘুমুতে যাবার আগে এই বিশেষ গন্ধটা আমার নাকে না এলে ঘুম হয় না।

টানা বারান্দায় কে যেন অস্থির ভঙ্গিতে হাঁটছে! অস্থির ভঙ্গিতে হাঁটার মতো মানুষ আমাদের বাড়িতে কেউ নেই। আমরা সবাই খুবই সুস্থির। দ্র বিনয়ী এবং নিচু গলায় কথা বলা টাইপ ফ্যামিলি। বাবা যখন মার সঙ্গে ঝগড়া করেন তখনও তাঁর গলা ভদ্রতার সীমা মেনে চলে। পাশের বাড়ির কেউ তাঁর রাগারাগি শুনে ফেলবে কিংবা রান্নাঘরের কাজের বুয়া শুনে

ফেলবে এমন কখনো হবে না। বাবা যখন বাড়াবাড়ি ধরনের রাগ করেন তখন নিজে কথা বলা বন্ধ করে দেন। তার রাগের কঠিন কথাগুলো আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হয়। আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার দিনে বাবা-মার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই হলো। এক পর্যায়ে বাবা খুবই রেগে গেলেন এবং আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোর মাকে বলতে এ বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন তার মায়ের বা বোনের বাড়িতে যেন থেকে আসে। তাকে অসহ্য লাগছে। মুখের দিকে তাকালেই গায়ে আগুন ধরে যাচ্ছে। প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে। ঘাড় ব্যথা করছে। শেষে স্ট্রোক ফোক হয়ে বেকায়দা অবস্থা হবে।

আমি মার কাছে গিয়ে বললাম, মা, বাবা বোধহয় তোমার সঙ্গে রাগরাগি করছিল। এখন যে-কোনো কারণেই হোক রাগটা ঝপ করে পড়ে গেছে। বাবা এখন চাচ্ছে পহেলা বৈশাখে তোমাকে যে শাড়িটা কিনে দিয়েছিল তুমি যেন সেই। শাড়িটা পরে বাবার সামনে যাও।

মা থমথমে গলায় বললেন, শাড়ি পরে তার সামনে যেতে বলল? একটু আগে একগাদা কুৎসিত কথা বলেছে, আর এখন বলছে শাড়ি পরে তার সঙ্গে ঢং করতে? আমি কি কাছুয়া না-কি?

কাছুয়া আবার কোন বস্তু?

কোন বস্তু সেটা তোকে বলতে পারব না। আসল কথা তোর বাপের সঙ্গে অনেক ঢং করেছি। আর ঢং করব না।

ঢং করতে হবে না। তুমি সেজে গুজে সামনে যাও। শুধু একটা রিকোয়েস্ট মা–কালচে টাইপ লিপস্টিক ঠোঁটে দেবে না। তোমাকে মানায় না।

ঐ শাড়ি পরব কী করে? ব্লাউজ বানানো হয় নি।

কাছাকাছি কোনো ব্লাউজ নেই?

খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে।

তুমি খুঁজতে থাক মা। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আজ প্রথম পরীক্ষা, আধা ঘণ্টা আগে যেতে হবে। সীট কোথায় পড়েছে খুঁজে বের করতে হবে।

ঐ শাড়িটাই বা হঠাৎ করে পরতে বলছে কেন?

ঐ শাড়ি নিয়ে তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই রোমান্টিক কিছু ব্যাপার ট্যাপার আছে। তোমাদের ঝগড়ার ব্যাপারগুলি আমি জানি। রোমান্টিক ব্যাপারগুলিতে জানি না।

আমি মার সামনে থেকে চলে গেলাম। মা গেলেন শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ খুঁজতে। তিনি ঠিকই শাড়ি পরে সেজে গুজে বাবার সামনে যাবেন এবং শুকনো গলায় বলবেন, পরলাম তোমার শাড়ি। এখন কী করতে হবে? নাচব?

আমার অতি বুদ্ধিমান বাবা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলবেন ঘটনা কী। তিনি নিজেকে সামলে নেবেন এবং হাসি মুখে বলবেন, বাহ্, তোমাকে খুব মানিয়েছে তো। একটু নাচ, খারাপ কী?

আমার মা যে খুবই বোকা টাইপ একজন মহিলা তা বোঝা প্রায় অসম্ভব। যে-কোনো বিষয় নিয়ে তিনি বেশ গুছিয়ে কথা বলেন। তাঁর কথা শুনলে মনে হয় ঐ বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান আছে। আসলে তা না, মা জগতের বেশির ভাগ বিষয় সম্পর্কে কিছু জানেন না। জানার আগ্রহও নেই। তবে এই ঘটনা বাইরের কারোর বোঝর সাধ্যও নেই। উদাহরণ দিয়ে বলি, একবার আমাদের ড্রয়িংরুমে বাবার কিছু বন্ধু (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এদের সঙ্গে বাবার সামান্য যোগাযোগ আছে। দু তিন মাস পরপর দাওয়াত করে খাওয়ান। মিলে আড্ডা জমিয়েছে। মা-ও আছেন তাদের সঙ্গে। তুমুল আলোচনা চলছে। আলোচনার বিষয় ব্ল্যাক হোল। মাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনছেন। এবং ব্ল্যাকহোলের রহস্যময়তায় তিনি চমৎকৃত। স্টিফান হকিং লোকটির মেধায় অভিভূত।

আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, ব্ল্যাক হোলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ভয়াবহ। সে সবকিছুই টেনে নিজের ভেতর নিয়ে নেয়। আচ্ছা, এখন যদি সমান ক্ষমতার দুটা ব্ল্যাক হোল সামনাসামনি চলে আসে তখন কী হবে? দুজনই তো চেষ্টা করবে অন্যজনকে নিজের ভেতর নিয়ে আসতে।

আড্ডা কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল। তারপর সবাই কথা বলতে শুরু করল মার দেয়া সমস্যা নিয়ে। সবাই মহাউৎসাহী। শুধু বাবা বিরক্ত মুখে মার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কারণ তিনি জানেন মা ভেবেচিন্তে কিছু বলেন নি। মনে একটা কথা এসেছে, বলে ফেলেছেন— এখন আবার যাবেন চা-নাস্তার ব্যবস্থা করতে। দুটা সমান শক্তির ব্ল্যাক হোল মুখোমুখি থাকলে মার কিছুই যায় আসে না। ওরা ওদের মতো দড়ি টানাটানি করুক। দুইজন একটা সময় দুইজনকে গিলে ফেলুক। চায়ের সঙ্গে নাস্তা ঠিকমতে দিতে পারলেই তিনি খুশি।

অস্থির ভঙ্গিতে টানা বারান্দায় বাবা হাঁটাহাঁটি করছেন। আমাকে দেখে এমনভাবে তাকালেন যেন চিনতে পারছেন না। এর একটাই অর্থ কোনো একটা বিষয় নিয়ে বাবা খুব চিন্তিত। আমি বললাম, বাবা ঘুম আসছে না?

বাবা বললেন, এখনো বিছানায় যাই নি। কাজেই ঘুম আসছে কি আসছে না বুঝতে পারছি না।

এনি প্রবলেম?

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, টগরের ঘরে একটা ছেলে এসেছে। ছেলেটাকে আমি চিনি। পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছেলেটা মনে হয় রাতে থাকতে এসেছে। আমি নিশ্চিত। আগেও কয়েক রাত এ বাড়িতে কাটিয়েছে।

আমি বললাম, এটা এমন কোননা সমস্যা না। আমি ভাইয়াকে গিয়ে বলছি ছেলেটাকে বিদায় করে দিতে।

ছেলেটির সামনে কিছু বলবি না। এদের ঘটানো ঠিক না। তুই বরং টগরকে ডেকে নিয়ে আয়। যা বলার আমি বলব।

ভাইয়ার ঘরের দরজা খোলা। ঘরে বাতি জ্বলছে। ভাইয়া চেয়ারে বসে কী যেন লিখছে। এত রাতে আমাকে ঢুকতে দেখে সে কিছু মাত্র অবাক হলো না। যেন। সে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। লেখা থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, কী ব্যাপার।

আমি বললাম, কোনো ব্যাপার না। তোমার কাছে কেউ কি এসেছিল? ভাইয়া অবাক হয়ে বলল, না তো!

বাবার ধারণা কেউ তোমার কাছে এসেছিল। বাবা এটা নিয়ে খুব চিন্তিত। ভাইয়া তুমি খুব খেয়াল রাখবে কেউ যেন তোমার কাছে না আসে। আর যদি এসেও পড়ে, চেষ্টা করবে তৎক্ষণাৎ বিদায় করতে।

তাই তো করি।

বাবার ধারণা তুমি উল্টোটা করে। মাঝে মাঝে তোমার দু একজন বন্ধু তোমার ঘরে রাত কাটায়।

আর কিছু বলবি?

বলব। কথাগুলো শুধু যে বাবার তা না। আমারও কথা। ভাইয়া, সাবধান। থাক। সময়টা খুব খারাপ।

আচ্ছা ঠিক আছে।

তুমি কী লিখছ?

ভাইয়া চট করে খাতা বন্ধ করে বলল, কিছু লিখছি না। তোর কথা শেষ হয়ে থাকলে চলে যা।

কাউকে চিঠি লিখছ না-কি?

ভাইয়া মাথা নিচু করে হাসল। তার হাসি মুখ দেখে আমার আবারো মনে হলো ঢাকা শহরের প্রথম তিনজন রূপবান যুবকের মধ্যে ভাইয়া একজন। শৈশবে যাদের খুব সুন্দর দেখায় যৌবনে তারা কেমন যেন ভোতা টাইপ হয়ে যায়। ভাইয়ার বেলায় ঘটনা অন্যরকম। যত দিন যাচ্ছে, সে ততই সুন্দর হচ্ছে। আমার বুকে ধাক্কার মতো লাগল। প্রকৃতি রূপবান পুরুষ পছন্দ করে না। তাদের মধ্যে বড় ধরনের কিছু সমস্যা দিয়ে দেয়। ভাইয়ার ভেতর কোননা সমস্যা দিয়ে দেয় নি তো?

বাবা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, টগরকে বলেছিস?

কিছু বলতে হয় নি বাবা। ভাইয়ার ঘর ফাঁকা। মশামাছি পর্যন্ত নেই। দেয়ালে একটা কালো রঙের টিকটিকি ছাড়া কিছু নেই।

ভালো করে দেখেছিস? খাটের নিচে বসে নেই তো?

খাটের নিচে বসে থাকবে কেন?

এরা ডেনজারাস ছেলে। খাটের নিচে বসে থাকবে। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে। দরজার আড়ালে থাকবে। যা, আবার যা।

কোনো দরকার নেই বাবা।

দরকার আছে কিনা সেটা আমি বুঝব। তোকে দেখতে বলছি তুই দেখ।

আমি আবারো সিঁড়ির দিকে এগুলাম। ভাইয়ার ঘরে দ্বিতীয়বার যাবার কোনো অর্থ হয় না। একতলার বারান্দায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে চলে আসব। বাবা নিশ্চয়ই দোতলার বারান্দা থেকে টেলিস্কোপ ফিট করে বসে থাকবেন না দেখার জন্যে যে আমি দায়িত্ব পালন করছি কি-না।

ভাইয়ার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাতি নেভানো। আমি নিঃশব্দে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। কান পাতলাম। ভাইয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। সে যে একা একা কথা বলছে তাও না। যে জবাব দিচ্ছে তার গলার স্বর ভারি। রেডিও-টিভির এ্যানাউনসারদের মতো গলা। কথাবার্তা হচ্ছে খুবই হাস্যকর বিষয় নিয়ে। মোটা গলার মানুষটা বলছে শিউলি ফুলের পাতা দিয়ে এক ধরনের ভাজি হয়। টগর তুই খেয়েছিস কখনো?

ভাইয়া বলল, না।

কচি পাতাগুলি কড়া করে তেলে ভাজা হয়, সঙ্গে থাকে প্রচুর পেয়াজ-রসুন আর শুকনা মরিচ। খেতে অসাধারণ হয়। গ্রামে যখন যাই এটাই হয় আমার প্রধান খাদ্য। দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য কি জানিস?

না।

দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য হলো নাইল্যা পাতা ভাজি।

নাইল্যা পাতাটা কী?

পাট শককে বলে নাইল্যা পাতা। পাট শাক রান্নার দুটো পদ্ধতি আছে। একটা ঝোল ঝোল, আরেকটা শুকনা শুকনা। আগুন গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের ওপর শুকনা নাইল্যা পাতা ছড়িয়ে দিয়ে যদি ভাত খাস তাহলে তোর মুখে এই জিনিস ছাড়া কিছুই রুবে না। দেখি একটা সিগারেট দে।

সিগারেট তো নাই।

সর্বনাশ! সিগারেট ছাড়া এত বড় রাত কাটাবো কী করে?

দোকান থেকে নিয়ে আসব?

আরে না। তোর বাসার সামনে পুলিশের দুজন ইনফরমার বসে আছে। তোর বাবা তো সিগারেট খায় তার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ম্যানেজ করতে পারবি না?

না।

একটা কাগজ দলা পাকিয়ে সিগারেটের মতো বানিয়ে দে। এটাই টানি। কিছু ধোঁয়া যাক। এতে দুটা কাজ হবে সিগারেটের তৃষ্ণা মিটবে। ক্ষুধাটা কমবে।

আমি নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলাম। বাবা বেতের চেয়ারে ঝিম ধরে বসে। আছেন। তার গা থেকে হালকা গন্ধ আসছে। অর্থাৎ তিনি আড়াই পেগ থেকে তিন পেগ হুইস্কি খেয়ে ফেলেছেন। বাংলাদেশে মদ্যপান আইন করে নিষিদ্ধ। তবে বিত্তবানদের জনো আইনের ফাঁক আছে। বিত্তবানদের জন্যে বাংলাদেশ সরকারের আবগারী ডিপার্টমেন্ট মদ খাওয়ার লাইসেন্স ইস্যু করে। সেখানে লেখা থাকে স্বাস্থ্যগত কারণে তাকে এই পরিমাণ মদ্যপানের অনুমতি দেয়া হলো। বাবার এই লাইসেন্স আছে। বাবা বললেন, কী দেখলি?

দেখলাম কেউ নেই।

খাটের নিচ, বাথরুম সব দেখেছিস।

হ্যাঁ।

আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখেছি একটা ছেলে বিড়ালের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝাঁ করে ওর ঘরে ঢুকল। স্ট্রাইপ শার্ট গায়ে।

তুমি তো মানসিকভাবে উত্তেজিত এই জন্যে এসব দেখেছ।

মানসিকভাবে উত্তেজিত হব কী জন্যে?

আজহার চাচা তোমাকে কাফনের কাপড় দিয়েছে এরপর থেকেই তুমি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েছ। তোমার চিন্তা কাজ করছে না।

চিন্তা ঠিকই কাজ করছে, আমি শুধু ভাবছি একটা লোক কী করে কাফনের কাপড় উপহার হিসেবে নিয়ে আসে।

উনার কাছে মনে হয়েছে ভালো উপহার। বাবা যাও তুমি শুয়ে পড়। রাত জাগলে তোমার শরীর খারাপ করে।

তুই শুবি না?

আমার সামান্য দেরি হবে।

দেরি হবে কেন?

রাতে ভাত খাই নি। এখন দেখি প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে। ফ্রীজের ঠাণ্ডা ভাত খাব না। নতুন করে ভাত রাঁধব। তুমি বিড়বিড় করছ কেন?

কাফনের কাপড়টা দিয়ে গাধাটা আমার মেজাজটা খারাপ করে দিয়েছে। আর তোর মার তো বুদ্ধির কোনো সীমা নেই! সে কাপড়টা রেখে দিয়েছে। ড্রেসিং টেবিলের উপরে, যেন ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে।

এক কাজ করো কাপড়টা তুমি আমার কাছে দিয়ে দাও। আমি ওয়ার্ডড্রোবে রেখে দেব।

আরে না। তুই বাচ্চা মানুষ। তুই কেন তোর ঘরে কাফনের কাপড় রাখবি।

বাবা তুমি ব্যাপারটা মাথা থেকে দূর করে ঘুমুতে যাও। রাতে না ঘুমালে তোমার খুবই শরীর খারাপ করে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার প্রেসার বেড়েছে। প্রেসার মেপে দেব?

দরকার নেই। গাধাটা কী করেছে শোন, কাফনের কাপড়ে আর মাখিয়ে রেখেছে। নাক থেকে আতরের গন্ধটা যাচ্ছে না। সাবান পানি দিয়ে নাক ধুয়েছি, তারপরেও যাচ্ছে না। তুই গন্ধ পাচ্ছি না?

না, পাচ্ছি না।

মানুষের সামান্য সেন্সও থাকবে না।

আমার হঠাৎ ইচ্ছা করল বাবাকে একটা বিপদে ফেলতে। কাজটা ঠিক না, অন্যায়। তারপরেও মনে হলো— আচ্ছা দেখি তো কী হয়। আমি বললাম, বাবা সরু নদীর ইদ্দিস ভাষা কী?

বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, আজহার চাচাকে তুমি সরু নদীর ইদ্দিস ভাষাটা বলছিলে।

কী বলেছিলাম?

বলেছিলে মেরাং গা। ছেরাং হচ্ছে সরু, গা হলো নদী।

ঠাট্টা করছিলাম। ইদ্দিস ভাষা আমি জানি না।

তুমি ঠাট্টা করে বলছিলে না। খুবই সিরিয়াসভাবে বলছিলে। আজহার চাচা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছে।

আমি যে এই ছোট্ট মিথ্যাটা বলেছি তার পেছনে ভালো যুক্তি আছে। যুক্তিটা শুনবি?

এর পেছনে তোমার কোনো যুক্তি নেই বাবা। যুক্তিটা তুমি এখন ভেবে ভেবে বের করবে। আমি নিশ্চিত তুমি বেশ ভালো যুক্তিই বের করবে। যাই হোক তুমি ভেবে চিন্তে ভালো একটা যুক্তি বের করো। আমি ভোর বেলা শুনব। এখন দয়া করে ঘুমুতে যাও।

বাবা আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন কি-না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, আমি লক্ষ করেছি আজহার এলেই তুই খাতির যত্নের একটু বাড়াবাড়ি করি। এটা করবি না।

কেন আমি বললাম। বাবা, তুমি কি আজহার চাচাকে ভয় পাও?

বাবা থমথমে গলায় বললেন, ভয় পাবার প্রশ্ন আসছে কেন?

আমার মনে হচ্ছে তুমি ভয় পাও। আজহার চাচা না হয়ে যদি অন্য কেউ তোমাকে কাফনের কাপড় দিত তুমি তাকে কঠিন কিছু কথা শুনিয়ে দিতে।

আমি ভদ্রতা করেছি। তাটাকে তুই ভেবে বসলি ভয়।

তোমার মধ্যে দ্রতার বাইরেও কিছু ছিল।

বাবা বিরক্ত গলায় বললেন, স্মার্ট হওয়া ভালো। কিন্তু নিজেকে অতিরিক্ত স্মার্ট ভাবাটা ভালো না।

আমি স্মার্ট না বাবা। আমি যা করি তা হলো দুই-এর সঙ্গে দুই যোগ করে চার হয়েছে কি-না দেখি। সবার বেলায় তাই হয়। তোমার বেলায় দুই-এর সঙ্গে দুই যোগ করলে চারের কিছু কম হয়। সেই কমটা কোথায় যায় সেটা বুঝতে পারি না।

তুই কী বলতে চাচ্ছিস পরিষ্কার করে বল তো।

আমি শক্তি গলায় বললাম, ভাইয়ার কাছে যে ছেলেটা এসেছে বলে তুমি ভাবছ এই ছেলেটা কে?

আমি কী করে জানব সে কে?

আমার ধারণা তুমি তাকে চেন। তোমার সঙ্গে এই ছেলের কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ হয়েছে। নয়তো তুমি ভয়ে এত অস্থির হতে না।

বাবা কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

আমি রওনা হলাম রান্নাঘরের দিকে। তস্তুরী বেগমকে ডেকে তুলে গরম ভাত রান্না করতে হবে। তস্তুরী বেগমের শাড়ির আঁচলে আলাউদ্দিনের চেরাগের একটা মিনি সাইজ দৈত্য বাস করে বলে আমার ধারণা। এই দৈত্য রান্নাবান্না ছাড়া অন্য কাজ পারে না। যে-কোনো রান্না এই দৈত্য অতি নিমিষে শেষ করে ফেলতে পারে। আমি আমার নিজের জন্যে রান্না

করাচ্ছি না। ভাইয়ার ঘরে যে। ছেলেটি বসে আছে সে ক্ষিধেয় কাতর আছে। গরম ভাত তার জন্যে। অপ্রত্যাশিতভাবে গরম ভাত পেয়ে সে অভিভূত হবে। এই মজার ঘটনাটা সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মনে রাখবে এবং অনেক লোকের সঙ্গে গল্প করবে। এই ছেলে যদি বিয়ে করে তাহলে বাসর রাতে স্ত্রীর সঙ্গে এই গল্পটিও করবে। তার মেয়ে যখন বড় হবে কোনো এক রাতে পিতা-কন্যা ভাত খেতে বসে গল্প করার সময় এই গল্প উঠে আসবে। মেয়ের মা বিরক্ত গলায় বলবে— আচ্ছা এই এক গল্প তুমি কবার করবে? বন্ধ করে তো।

মেয়ে বলবে, বন্ধ করতে হবে না, আমার শুনতে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে। আচ্ছা বাবা যে মেয়ে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছিল তার নাম কী?

নাম তো মা জানি না। নাম জিজ্ঞেস করা হয় নি।

মেয়েটা দেখতে কেমন?

সেটাও বলতে পারছি না। অন্ধকার ছিল তো। ভালোমতো দেখতে পাই নি।

এই পর্যায়ে মেয়ের মা মহা বিরক্ত হয়ে বলবে ঐ মেয়ে মা রূপবতী ছিল। রূপবতী না হলে এই এক গল্প তোর বাবা পাঁচ লক্ষবার করে।

ভাইয়ার ঘরে বসে যে নিচু গলায় গল্প করছিল সে রাতে অবশ্যই ভাইয়ার ঘরে ঘুমুবে না। সে ঘুমুবে ছাদে। ছাদে চিলেকোঠার মতো আছে। চিলেকোঠাটা স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারই এক কোণায় চাদর পেতে শোবার ব্যবস্থা আছে। বিপদজনক পরিস্থিতিতে

এক ছাদ থেকে লাফিয়ে অন্য ছাদে যাওয়া যায়। এবং অতি দ্রুত পালিয়ে যাওয়া যায়। ভাইয়ার বন্ধুদের অনেকেই এই কাজটা অতীতে করেছে।

ট্রে হাতে আমি চিলেকোঠার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, খেতে আসুন। ছাদ এবং চিলেকোঠা অন্ধকার হলেও সিঁড়ি ঘরে বাতি জ্বলছে। তার আলোয় কাজ চলার মতো দেখা যাচ্ছে। চিলেকোঠায় বাতি আছে। তার সুইচ বাইরে। ইচ্ছা করলেই আমি বাতি জ্বালাতে পারি। তা না করে আবারো বললাম ভাত নিয়ে এসেছি খেতে আসুন। তিন চার সেকেন্ড কোনো রকম শব্দ হলো না। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ভাইয়ার বয়েসী এক যুবক বের হয়ে এল। তার চোখ ভর্তি বিস্ময়। আমি বললাম, আপনি কি অন্ধকারে খেতে পারবেন, না বাতি জ্বালাতে হবে?

সে কিছুই বলল না। আমি বললাম, ঘরে খাবার কিছু ছিল না। গরম ভাতের ওপর ঘি দিয়ে দিয়েছি। শুকনা মরিচ ভেজে দিয়েছি। বেগুন ভাজা আছে। আর আপনার একটা পছন্দের খাবারও আছে। পাট শাক ভাজি। আমাদের বুয়ার দেশ ময়মনসিংহের ফুলপুর। সে দেশ থেকে টিন ভর্তি করে পাট শাক শুকিয়ে নিয়ে আসে।

টগরের সঙ্গে আমি যখন কথা বলছিলাম তখন আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন?

জি শুনছিলাম। বাবার সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটা সিগারেটও আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি।

থ্যাংক য়ু।

আমি যদি আপনাকে একটা অনুরোধ করি আপনি রাখবেন?

অবশ্যই রাখব।

ভাইয়ার কাছে কখনো আসবেন না। ভাইয়া বোকা মানুষ। সে কোনো কিছুতে না থেকেও মহা বিপদে পড়ে যাবে।

তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি আর এ বাড়িতে আসব না।

আপনি খাওয়া শুরু করুন। আপনার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি থাকব। কেউ খুব আগ্রহ করে ভাত খাচ্ছে এই দৃশ্য দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। হাত ধোয়ার পানি এনেছি। নিন হাত ধোন।

ভাইয়ার এই বন্ধুর নাম আমি জানি না। আগে দেখেছি কি-না মনে করতে পারছি না। সে হাত ধুয়ে খেতে বসেছে। ভাতের দলা মাখিয়ে মুখে দিতে গিয়ে নামিয়ে রেখে তাকাল আমার দিকে।

আমি বললাম, আরাম করে খান তো।

সে খুবই তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে। একজন ক্ষুধার্ত মানুষ খুব তৃপ্তি নিয়ে খাচ্ছে এই দৃশ্য জগতের মধুর দৃশ্যের একটি কার যেন কথা? বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে। কথাটা বাবার কাছ থেকে শুনেছিলাম।

২. প্রথম ক্লাস

প্রথম ক্লাস সকাল সাড়ে নটায়। এই ক্লাসটায় আমি রোজ লেট করি। এবং রোজই ভাবি আজ থেকে ক্লাস শুরু হবার দশ মিনিট আগেই ইউনিভার্সিটিতে চলে যাব। ফজলু মিয়ার ক্যান্টিনে কফি খাব। ফজলু মিয়ার কফি এমন অসাধারণ কিছু না। তবে খুব তাড়াহুড়া করে খেলে অসাধারণ লাগে। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে এক্ষণি ক্লাসে ঢুকতে হবে, অথচ হাতে মগভর্তি কফি তখন কফিটা লাগে অসাধারণ।

আমি গাড়িতে উঠতে যাব–দোতলার বারান্দা থেকে মা হাত ইশারায় ডাকলেন। খুবই ব্যস্ত ভঙ্গি। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কোনো দুর্ঘটনা বাসায় ঘটে গেছে। আমি গাড়ি থেকে নামলাম, আবার দোতলায় উঠলাম। মা বললেন, যাচ্ছিস কোথায়?

এ ধরনের প্রশ্নের কোনো মানে হয়? মা জানে না আমি কোথায় যাচ্ছি? সকাল নটায় তাড়াহুড়া করে ঘর থেকে বের হবার উদ্দেশ্য তো একটাই।

ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি মা।

আজ না গেলে হয় না?

তেমন ভয়ঙ্কর কোনো কিছু ঘটে গেলে না গেলে হয়। ভয়ঙ্কর কিছু কি ঘটেছে?

আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি?

সেই এক জায়গাটা কোথায়? তাড়াতাড়ি করে বল তো মা। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মা ঝলমল করে উঠলেন। উত্তেজিত গলায় বললেন, মৌচাক মার্কেট। সিল্ক শাড়ির একটা এগজিবিশন হচ্ছে। বাণিজ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন।

তুমি দাওয়াতের কার্ড পেয়েছ?

আমি কার্ড পাব কেন? আমি কি মহিলা এমপি? জাস্ট দেখতে যাব। পছন্দের কোনো শাড়ি পেলে কিনব। তুই পছন্দ করে দিবি। অনেক শাড়ি এক সঙ্গে দেখলে আমার মাথা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়! যে রঙটা সেখানে সবচে ভালো মনে হয়, বাসায় এনে দেখি সেটাই সবচে খারাপ।

তুমি শাড়ি কিনবে এইজন্য আমি ক্লাস মিস দেব?

একদিন দিবি। একদিনে তো তুই এমন কিছু পণ্ডিত হয়ে যাবি না। শাড়ি এগজিবিশনে প্রথম দিনেই যেতে হয়। ভালো ভালো শাড়ি প্রথম দিনেই শেষ হয়ে যায়।

আমি যাব না মা।

এরকম করিস কেন? তুই তো জানিস আমি একা একা কোথাও যেতে পারি না। আমার একা যাওয়া ঠিকও না।

ভাইয়াকে নিয়ে যাও। ও ঘরে বসে আছে।

ছেলেমানুষ সে, শাড়ির কী বুঝবে?

না বুঝলে না বুঝবে – মা আমি গেলাম। আজও আমার দেরি হয়ে গেল— ফজলু মিয়ার কফি খাওয়া হলো না।

মা উৎসাহী গলায় বললেন, ফজলু মিয়ার কফি ব্যাপারটা কীরে? তোর মুখে আগেও কয়েকবার শুনেছি।

আমি জবাব না দিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামছি। মা-ও নামছেন। তাঁকে দেখেই মনে হচ্ছে তিনি টেনশনে পড়েছেন। ফজলু মিয়ার কফির রহস্য ভেদ না হওয়া পর্যন্ত টেনশন কমবে না। আমি নিশ্চিত গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার মোবাইল বেজে উঠবে। মা জিজ্ঞেস করবেন ফজলু মিয়ার কফি ব্যাপারটা কী-রে? ফ্লাস্কে করে আমার জন্যে নিয়ে আসিস তো।

মোবাইল টেলিফোনের ঝামেলা ক্লাসের মধ্যেও চলতে থাকবে। মা যদি শেষ পর্যন্ত শাড়ির এ এগজিবিশনে যান তাহলে সেখান থেকে সাজেশান চেয়ে। টেলিফোন আসবে, হালকা গোলাপি রঙটা তোর কাছে ভালো লাগে না হালকা আকাশি? গাঢ় রঙের কোন শাড়ি কিনব? মোটা মানুষদের নাকি গাঢ় রঙ মানায়। তাদের চিকন দেখা যায়। সত্যি না-কি?

যথারীতি আজও ক্লাসে দেরি হলো। নতুন একজন টিচার এসেছেন। রোল কল শুরু হয়েছে। তিনি ডাকলেন, রোল ফিফটিন। আমি ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, ইয়েস স্যার। পুরো ক্লাস এক সঙ্গে হেসে উঠল। আমাদের এই ক্লাসের হাসি রোগ আছে। অতি তুচ্ছ কারণে সবাই আমরা এক সঙ্গে হাসি। নতুন টিচার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন তোমার নাম কী?

মৃন্ময়ী।

নামটা রেজিস্টার খাতায় আছে, তারপরেও আলাদা করে নাম জিজ্ঞেস করায় আনন্দ আছে। তাই না?

জ্বি স্যার।

ভদ্রলোক বললেন, আমাকে স্যার ডাকবে না। স্যার ডাক আমার খুবই অপছন্দের। ডিজাইন ক্লাসে আমরা সবাই ছাত্র। ঠিক আছে?

জ্বি, ঠিক আছে।

যাও বোস। তুমি বসার পর ক্লাশ শুরু হবে।

আমি ফরিদার দিকে এগুচ্ছি। ফরিদার পাশের চেয়ারটা আমার। সব সময় সেখানেই বসি। কিছু একটা সমস্যা মনে হয় হয়েছে। সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। একজন ছাত্রী সামান্য দেরি করে ক্লাসে এসেছে। সে তার জন্যে নির্দিষ্ট করা চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছে এটা এমন কোনো দৃশ্য না যে দম বন্ধ করে তাকিয়ে থাকতে হবে। এটা তো আলফ্রেড হিচককের ছবির সেট না। আর্কিটেকচার বিভাগের ফোর্থ সেমিস্টারের ডিজাইন ক্লাস। নতুন টিচার যে তাকিয়ে আছেন সেটা উনার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি। মেয়েদের মাথার পেছনে ছটা অদৃশ্য চোখ থাকে। কোনো পুরুষ যদি পেছন থেকে তার দিকে তাকায় তাহলে সে অদৃশ্য চোখ দিয়ে দেখতে পায়।

মৃন্ময়ী।

জ্বি।

তুমি কি সব সময় এই চেয়ারটায় বস?

জ্বি।

আজ প্রথমদিন, কাজেই আমি কিছু বলছি না। সবাই আজ তাদের পছন্দের জায়গায় বসবে। কাল থেকে এই নিয়ম থাকবে না। একই চেয়ারে কেউ দ্বিতীয় দিন বসবে না। মানুষ Conditional হতে পছন্দ করে। খাবার টেবিলে দেখবে প্রত্যেকের জন্যে জায়গা ঠিক করা। এই চেয়ারটা মার। এই চেয়ারটা বড় মেয়ের। খেতে বসলে ঐ চেয়ার ছাড়া কেউ বসবে না। মানুষ খুবই স্বাধীন প্রাণী কিন্তু অদ্ভুত কারণে সে ভালোবাসে শিকল পরে থাকতে। আমরা যারা ডিজাইন ক্লাসের ছাত্র তাদেরকে শিকল ভাঙতে হবে সবার আগে। মৃন্ময়ী কী বলছি বুঝতে পারছ?

পারছি স্যার।

আগে একবার বলেছি। আবারো বলি আমাকে স্যার ডাকবে না।

ফরিদা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার না ডাকলে আপনাকে কী ডাকব?

নাম ধরে ডাকবে। আমার নাম কাওসার। বোর্ড লিখে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক বোর্ডের কাছে গিয়ে বড় করে লিখলেন

COW-SIR

আমি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললাম। ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। নামের বিচিত্র বানান দিয়ে তিনি কি সবাইকে অভিভূত করতে চাইছেন? নাম নিয়ে এই রসিকতা তৈরি করতে তাঁর নিশ্চয়ই বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। এই রসিকতায় নিশ্চয়ই অতীতে অনেকে মজা পেয়েছে। আমি পাচ্ছি না। আমার বিরক্তি লাগছে। আচ্ছা আমি কি আমার নাম নিয়ে এমন কিছু করতে পারি? Mrinmoye-কে লেখা যেতে পারে

MR IN MOYE

তাতে লাভ কি কিছু হয়? নামের আগে MR চলে আসে এইটুকু লাভ।

ভদ্রলোকের বয়স কত হবে? পঁয়ত্রিশ কিংবা তারচেয়ে কম। পাঁচমিশালী রঙে ভর্তি শার্ট পরে আছেন। ডান হাতে লাল রঙের ব্যান্ড জাতীয় কিছু। পাংকু বলতে পারলে ভালো হতো। তা বলা যাবে না। ভদ্রলোকের Ph.D ডিগ্রি আছে। আমাদেরকে জানানো হয়েছে–অসম্ভব মেধাবী একজন টিচার জয়েন করছেন। তিনি ডিজাইন ক্লাস নেবেন। বড়লোকের ফেলটুস ছেলে হাতে লাল ব্যান্ড পরলে পাংকু হয়ে যায়, কিন্তু Ph.D ওয়ালা অসম্ভব মেধাবী কেউ কি তা হন? সহজ সাধারণ কিছু পরে থাকলে তাকে অনেক সুন্দর লাগত। আমার ধারণা ভদ্রলোক যদি কালো প্যান্টের ওপর হালকা হলুদ পাঞ্জাবি পরতেন তাঁকে অনেক বেশি মানাত।

ফরিদা ফিসফিস করে বলল, এই লোক না-কি দারুণ বিলিয়ন্ট। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে রেকর্ড নাম্বার পেয়ে পাস করেছে। কিন্তু নিজের নাম নিয়ে কী ছাগলামি করছে দেখেছি। আমাদের স্কুলের ছাত্র ভাবছে। কি-না কে জানে। যখন ধরা খাবে তখন টের পাবে।

ভদ্রলোক ফরিদার দিকে তাকিয়ে বলবেন তুমি মনে হয় আমাকে নিয়ে মাছ মাছ করছ।

ফরিদা মুখ শুকনা করে বলল, মাছ মাছ করছি মানে কী স্যার?

মাছ মাছ মানে Fish Fish. তুমি আমাকে নিয়ে ফিসফিস করছ। যাই হোক ভালো করে লক্ষ কর

আমার নামের মধ্যেই Sir আছে। নামের শুরুতে একটি নিরীহ প্রাণী আছে। আমি নিজেও ঐ প্রাণীটির মতোই নিরীহ। আমি যতদূর জানি আজ তোমাদের একটা প্রজেক্ট জমা দেবার কথা। টেবিল ল্যাম্প। তোমরা প্রজেক্ট এনেছ?

ফরিদা বলল, আমি ছাড়া সবাই এনেছে।

তুমি আনো নি কেন?

আমি কখনোই সময় মতো কোনো প্রজেক্ট জমা দিতে পারি না।

কোনো সমস্যা নেই। তোমার যখন প্রজেক্ট জমা দিতে ইচ্ছা করবে জমা দেবে। এতে নাম্বার কাটা যাবে না। আমার ক্লাসে নাম্বার কাটা যাবার কোনো সিস্টেম নেই। আর আমার ক্লাসে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের জবাব দেবার কিছু নেই।

প্রজেক্ট জমা নেওয়া শুরু করার আগে কিছুক্ষণ গল্প করলে কেমন হয়?

ফরিদা বলল, ভালো হয় স্যার।

কাওসার বলল, একটু আগেই বলেছি আমাকে স্যার ডাকা যাবে না। আমি প্রশ্নটা আবার করছি—প্রজেক্ট জমা নেওয়া শুরু করার আগে কিছুক্ষণ গল্প করলে কেমন হয়?

ফরিদা বলল, ভালো হয় ভাইয়া।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমার মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোক নিজেকে ইন্টারেস্টিং করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এক্ষুণি হয়তো পকেট থেকে কয়েন বের করে কয়েন ভ্যানিসের একটা ম্যাজিক দেখাবেন। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে জোক বলে সবাইকে হাসাবেন। কিছু জোক থাকবে মোটামুটি অশ্লীল। এবং তিনি যে মহাজ্ঞানী এই ব্যাপারটা বোঝানোর জন্যে কঠিন কঠিন সব তত্ত্ব কথা বলবেন। সদ্য আমেরিকা ফেরত শিক্ষকরা আমেরিকান শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক ফাজলামি শিখে আসে। সেই জিনিস যে বাংলাদেশে চলে না তা বুঝতে পারে না। কিছুদিন আমেরিকান ফাজলামি করে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত এই জ্বলোক দুতিন মাসের মধ্যেই বদলাবেন এবং সময়মতো প্রজেক্ট জমা না দেয়ার জন্যে নাম্বার কাটা শুরু করবেন।

আচ্ছা বলো, সুন্দর ব্যাপারটা কী? কিছু কিছু বস্তু দেখে আমরা বলি সুন্দর। কেন বলি? এই ছেলে নারিকেলের মালা দিয়ে একটা টেবিল ল্যাম্প বানিয়েছে। আমরা বললাম— সুন্দর হয়েছে। কেন বললাম!

কেউ জবাব দিল না। ভদ্রলোক বললেন, সুন্দর অসুন্দরের প্রভেদটা আমরা কীভাবে করি?

এবারও সবাই চুপ করে রইল। ভদ্রলোক তিনটা ফুলস্কেপ কাগজ দিয়ে দলা পাকিয়ে তিনটা বলের মতো বানালেন। তিনটা তিন ধরনের বল। তারপর বললেন, টেবিলের ওপর তিনটা বল দেখতে পাচ্ছ। তিনটা বলের মধ্যে একটা অনেক সুন্দর লাগছে। বলো দেখি কোনটা?

বেশ কয়েকজন ছাত্র এক সঙ্গে বলল, মাঝেরটা।

দ্রলোক বললেন, এখন দেখ কী করি বলগুলোর ওপর আমি আলো ফেলব। আলো এমনভাবে ফেলা হবে যে মাঝের বলটা আর সুন্দর লাগবে না।

আমি অবাক হয়েই দেখলাম ভদ্রলোকের কথা ভুল না। মাঝখানের বলটা এখন আর সুন্দর লাগছে না, বরং প্রথম বলটা সুন্দর লাগছে।

ভদ্রলোক মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বললেন, এখন বলো দেখি সুন্দর কী? Define beauty. মৃন্ময়ী তুমি বলো সুন্দর কী?

আমি চুপ করে আছি। সুন্দর অসুন্দরের কচকচানিতে যেতে চাচ্ছি না। তাছাড়া আমার মোবাইল বাজতে শুরু করেছে। মা টেলিফোন করেছেন। হয়তো শাড়ি বিষয়ক কিছু বলবেন। সিল্ক এগজিবিশনে মা যাবেন না তা হবে না। আমি মোবাইল অফ করে দিলাম।

মৃন্ময়ী চুপ করে আছ কেন? বলো সুন্দর কী? উঠে দাঁড়াতে হবে না। বসে বসে বলো। মোবাইলে মনে হয় কেউ একজন তোমাকে ফোন করেছে। নাম্বারটা দেখে রাখ। আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে কল ব্যাক করো।

আমি বললাম, যা দেখতে ভালো লাগে তাই সুন্দর।

তুমি বলতে চাচ্ছ যা দেখে চোখ আরাম পায় তাই সুন্দর?

জ্বি।

তার মানে হলো চোখ সব সময় আরাম পায় না। সব সময় একটা কষ্টের মধ্যে থাকে। মাঝে মাঝে সে আরাম পায়। যা দেখে সে আরাম পায় তাকে বুলি সুন্দর। এই তো?

আমি বুঝতে পারছি না একটু কনফিউজড বোধ করছি।

কনফিউজড বোধ করলে লজ্জা পাবার কিছু নেই। সৌন্দর্যের ব্যাখ্যার ব্যাপারে অনেক বিখ্যাত মানুষই কনফিউজড বোধ করেছেন। নোবেল পুরস্কার পাবার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গিয়েছিলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। আইনস্টাইন হঠাৎ করে তাঁকে প্রশ্ন

করলেন, সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা কী? রবীন্দ্রনাথকে থমকে যেতে হয়েছিল। যাই হোক, মৃন্ময়ী সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা দিতে পারছে না।

ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখে একেকজনের দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টি হঠাৎ থমকে গেল। তিনি বললেন— Young man আসগার না তোমার নাম?

আসগার খুবই হকচকিয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়েস স্যার।

তোমার নাম যে আসগার এটা কী করে জানলাম বলো তো?

বলতে পারছি না স্যার।

আমি রোল কল করার সময় সবার নাম দেখে নিয়েছি। সতেরোটা নাম মনে রাখা এমন কোনো কঠিন ব্যাপার না। নাম মনে রাখারও পদ্ধতি আছে। তোমরা চাইলে তোমাদের শিখিয়ে দেব। এখন তুমি বলো সৌন্দর্য কী?

জানি না স্যার।

মনে কররা তুমি গুলশান এলাকায় হেঁটে যাচ্ছ। চারপাশে দালান। তুমি কোনোটাকে বলছ সুন্দর, কোনোটাকে বলছ অসুন্দর। কেন বলছ? বিচার বিবেচনাটা কীভাবে করছ?

আসগার বলল, আমি কোনো বিবেচনা করি না স্যার। আমি হেঁটে চলে যাই। হাঁটার সময় মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটি।

ক্লাসের সবাই হেসে উঠল। সবচে বেশি হাসলেন কাওসার সাহেব। হাসি থামিয়ে বললেন, ভালো আর্কিটেক্ট হবার সম্ভাবনা তোমার সবচে বেশি। যারা সারাক্ষণ সুন্দর সুন্দর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তারা আসল কাজ পারে না। যেমন ধরো আমি। আমি যে কটা ডিজাইন করেছি তার সবকটাই অতি নিম্নমানের। যাই হোক, এস মূল বক্তব্যে ফিরে যাই– সৌন্দর্য সম্পর্কে আমার নিজের ব্যাখ্যাটা বলি। খাতা খুলবে না—আমি যা বলব শুধু শুনে যাবে, খাতায় নোট করবে না।

আমার নিজের ধারণা–জীবন্ত কিছু মানেই সুন্দর। জড় বস্তুকে তখনি সুন্দর মনে হবে যখন মনে হবে এর ভেতর প্রাণ আছে। প্রাণটা স্পষ্ট না, অস্পষ্ট। তবে আছে। যখন মনে হবে আছে তখনি সেটা আমাদের কাছে সুন্দর লাগে। এক গাদা রট আয়রন তুমি ফেলে রাখলে এর প্রাণ নেই কাজেই অসুন্দর। ওয়েল্ডিং মেশিন এনে জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে তুমি একটা খাট তৈরি করলে। খাটের মধ্যে প্রাণ তৈরি হলো। খাটটাকে দেখে মনে হচ্ছে কেউ যখন খাটে ঘুমুতে আসে তখন সে আনন্দিত হয়। কাজেই খাটে সৌন্দর্য তৈরি হলো। এই প্রাণ যে যত বেশি তৈরি করতে পারবে সে তত বড় শিল্পী। আমার বক্তৃতা কি কঠিন মনে হচ্ছে।

না।

এখন একটু কঠিন কথা বলি– সুন্দরের সঙ্গে সব সময় দুঃখবোধ মেশানো থাকে। মহান সৌন্দর্যের সঙ্গে বেদনাবোধ মেশানো থাকতেই হবে। এডগার এলেন পোর এই কয়েকটা লাইন ব্যাপারটা সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে। খাতা খোল, এই কয়েকটা লাইন খাতায় লিখে নাও। তার মতে সৌন্দর্য হচ্ছে

A feeling of sadness and longing
That is not akin to pain,
And resembles sorrow only
As the most resembles the rain.

তোমাদের প্রজেক্টগুলো জমা নিয়ে আমি এখন তোমাদের ছুটি দিয়ে দেব। তোমাদের একটা হোম এসাইনমেন্ট আছে—সৌন্দর্য কী? এই নিয়ে এক পৃষ্ঠার একটা লেখা লিখবে। কোন মনীষী সৌন্দর্য সম্পর্কে কী বলেছেন এইসব কচকচানি না। তুমি কী ভাবছ সেটা লিখবে। ঠিক আছে?

জ্বি ঠিক আছে।

এখন আমি তোমাদের কাছে একটা পরীক্ষা দেব। এক এক করে তোমাদের সতেরো জনের নামই আমি বলব। আমি যখন বলেছিলাম তোমাদের সবার নাম আমি জানি তখন তোমরা সেটা বিশ্বাস করে নি। প্রথমেই যদি আমার কথার ওপর বিশ্বাস না থাকে পরে আরো থাকবে না। টিচার হিসেবে আমি যা বিশ্বাস করাতে চাই তা বিশ্বাস করাতে পারব না।

ফরিদা বলল, স্যার আপনার পরীক্ষা দিতে হবে না। আপনি ফেল করবেন, তখন আমাদের সবার খারাপ লাগবে।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমাদের নাম্বার বলতে শুরু করলেন। কোনো ভুল হলো না। সবাইকে খানিকটা চমকে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মৃন্ময়ী রোল ফিফটিন ক্লাসের শেষে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আমি হঠাৎ একটা ধাক্কার মতো খেলাম। তবে সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাত করে সম্মতি জানালাম। এই ভদ্রলোকের আলাদা করে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার কারণটা স্পষ্ট না। তিনি কী বলতে চান সে সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা থাকলেও নিজেকে কিছুটা প্রস্তুত রাখা যেত। আকাশ জোড়া মেঘ থাকলে ছাতা হাতে পথে নামতে হয়। সুন্দরবনে মধুর খোজে বাওয়ালীরা যখন ঢেকে তাদের সঙ্গে একজন থাকে গাদা বন্দুক নিয়ে। প্রস্তুতি থাকেই। শুধু আমার কোনো প্রস্তুতি থাকবে না।

আমি লক্ষ করলাম ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা মুখে চাপা হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ক্লাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আসগার আমার ডেস্কের কাছে এসে বলল, আমাদের নতুন স্যারের জন্যে একটা নাম পাওয়া গেছে। তোমার এপ্রোভেল পাওয়া গেলেই নামটা চালু করা যায়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমার এপ্রোবেলের প্রশ্ন আসছে কেন?

তোমাকে উনি এপ্রোভ করেছেন বলেই তোমার এপ্রোভেলের প্রশ্ন আসছে। উনি নিজের নাম তো Cow-sir লেখেন, ঐটাই বাংলা করে গরু স্যার। উনার আপত্তি করার কিছু থাকল না। কি এপ্রোভ করছ তো?

আমি কিছু বললাম না, তবে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলাম কাওসার নামের এই ভদ্রলোক অতি দ্রুত গরু স্যার হিসেবে পরিচিত হবেন। এমন একটা নামের ভার বহন করার মতো

শক্তি ভদ্রলোকের কি আছে? থাকার কথা না। বেশির ভাগ মানুষের মনের জোর তেমন থাকে না। ভদ্রলোকের অবস্থা ছেড়ে দে ছাত্র সমাজ কেঁদে বাঁচি হবার কথা।

স্যার আসব?

ভদ্রলোক তাঁর ঘরে কম্পিউটারের কানেকশন জাতীয় কী করছিল। এখন চোখে চশমা। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে? ভাবটা এরকম যেন আমাকে চিনতেই পারছেন না। আমি বললাম, স্যার আমি মৃন্ময়ী।

কিছু বলবে?

আপনি বলেছিলেন ক্লাসের শেষে যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি। আমি দেখা করতে এসেছি।

ও আচ্ছা আচ্ছা। সরি ভুলে গিয়েছিলাম। এসো। চেয়ারটায় বোস।

আমি চেয়ারে বসলাম। আমার মেজাজ খারাপ লাগছে। ভদ্রলোক বেশ ভালো করেই জানেন তিনি আমাকে আসতে বলেছেন। তারপরেও ভান করলেন তাঁর মনে নেই। এই ভানটা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

মৃন্ময়ী তোমার কি বাড়িতে ফেরার খুব তাড়া আছে? তাড়া থাকলে আজ চলে যাও। অন্য আরেকদিন কথা বলব আমি পোর্ট লাইনের কানেকশনটা দিতে পারছি না। কানেকশন না দিতে পারা পর্যন্ত অন্য কোনো দিকে মন দিতে পারছি না।

আপনি কানেকশন দিন আমি অপেক্ষা করছি। কী জন্যে ডেকেছেন এটা না জানা পর্যন্ত আমার নিজের মধ্যেও এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করবে।

অস্বস্তি কাজ করবে কেন?

আজ আপনার সঙ্গে আমাদের প্রথম ক্লাস হলো। ক্লাসের মাঝখানে বেশ আয়োজন করেই আপনি আমাকে বললেন, আমি যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি। অস্বস্তির কারণটা এইখানেই।

তোমাদের এখানে কি এই নিয়ম যে কোনো শিক্ষক তার ছাত্রকে দেখা করতে বলতে পারবে না?

অবশ্যই বলতে পারবে। তবে তার জন্যে কারণ থাকতে হবে।

গল্প করার জন্যে আমি কাউকে ডাকতে পারি না? ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কি একটা সহজ সম্পর্ক তৈরি করা যায় না? সব সময় দূরত্ব থাকতে হবে? আমি। নিয়ম ভাঙতে চাই।

নিয়ম ভাঙতে হলে শক্তি লাগে। সেই শক্তি কি আপনার আছে?

আমার ধারণা আছে।

থাকলে তো ভালোই।

ক্লাসে আমার বক্তৃতা তোমার কেমন লাগল?

ভালো। তবে আপনার প্রধান চেষ্টা ছিল আপনি যে অন্যদের চেয়ে আলাদা এটা প্রমাণ করা। কেউ যদি আলাদা হয় এমিতেই তা ধরা পড়ে। আয়োজন করে আমি আলাদা এটা প্রমাণ করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। আপনার এই জিনিসটা আমার খারাপ লেগেছে।

তোমার নিজের কি মনে হয় না আমি অন্যদের মতো না? আমি অন্যদের চেয়ে আলাদা?

আমি শান্ত গলায় বললাম, আমাদের ক্লাসে সতেরো জন স্টুডেন্ট। এই সতেরো জনের ভেতর থেকে আপনি আমাকে সিঙ্গেল আউট করে প্রশ্নগুলো করছেন কেন?

কারণ তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। প্রথম দেখাতেই পছন্দের একটা কথা সমাজে প্রচলিত। ঐ ব্যাপারটাই ঘটেছে। তোমাকে আলাদা একটি মেয়ে বলে আমার মনে হয়েছে। আমি হয়তো অন্য আর দশজনের মতোই কিন্তু তুমি না। আমার ধারণা হয়েছে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে আমার ভালো লাগবে। এইজন্যেই তোমাকে খবর দিয়েছি। আমি যদি সমাজের আর দশজনের মতো হস্তাম আমি আমার পছন্দের ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতাম। অল্প অল্প করে তোমার সঙ্গে পরিচয় হতো। একদিন হয়তো ডিজাইনের একটা বই তোমাকে পড়তে দিলাম। বই ফেরত দেবার সময় এক কাপ কফি খাওয়ালাম। টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলাম যাতে ক্লাসের কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে টেলিফোন করতে পারো। তারপর একদিন তোমার টেলিফোন নাম্বার নিলাম। নানান ধাপ পার হয়ে

আসা। আমি সবগুলি ধাপ এক সঙ্গে পার হতে চাই। তুমি আমার কথায় হার্ট হচ্ছ না তো?

না হার্ট হচ্ছি না। আমি যখন আপনার ঘরে ঢুকলাম তখন কিন্তু আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি বা না-চেনার ভান করেছেন।

তুমি একটা ব্যাপার লক্ষ করে নি। আমি শর্ট সাইটেড মানুষ। আমার চোখে চশমা ছিল। কাছের জিনিস দেখার জন্য আমি যখন চশমা পরি তখন দূরের জিনিস দেখতে পাই না। তোমাকে আমি আসলেই চিনতে পারি নি। তুমি কি কফি খাবে? আমি খুব ভালো কফি বানাতে পারি।

না, কফি খাব না।

আইসক্রিম খাবে? আমি শুনেছি ঢাকা শহরে খুব ভালো ভালো আইসক্রিমের দোকান হয়েছে।

না আইসক্রিমও খাব না। আমাকে বাসায় যেতে হবে।

আমি তোমাকে নামিয়ে দেই। বাসাটাও চিনে আসি। কখননা যদি যেতে বলে চট করে চলে যেতে পারব। তোমাকে কষ্ট করে ঠিকানা বলতে হবে না। আমি যদি তোমাকে বাসায় নামিয়ে দেই তাতে কি তোমার আপত্তি আছে?

না, আপত্তি নেই।

থ্যাংক য়্যু।

আমি বিরক্ত বোধ করছি। বিরক্তি চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। আমাদের একজন শিক্ষক যদি আমাকে বাসায় নামিয়ে দিতে চান তাতে কোনো সমস্যা নেই। মানুষটা নিজেকে আলাদা প্রমাণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। চেষ্টাটা যে হাস্যকর তাও ভদ্রলোক বুঝতে পারছে না। মানুষটা কি বোক? যে এক লাফে অনেকগুলি সিঁড়ি পার হতে চায় তার প্রথমেই জানতে চাওয়া উচিত যাকে নিয়ে সে সিঁড়ি ভাঙতে চাচ্ছে সে কি তা চায়?

আমি বললাম, স্যার আপনার কি দেরি হবে?

স্যার হাসিমুখে বললেন, না দেরি হবে না। পোর্ট কানেকশন আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এক্সপার্ট কাউকে আনতে হবে। ভালো কথা— মোটর সাইকেলে চড়া কি তোমার অভ্যাস আছে?

মোটর সাইকেল?

গাড়ি আমার খুবই অপছন্দ। মোটর সাইকেল আমার অতি পছন্দের বাহন। মোটর সাইকেলে You can feel the speed. মোটর সাইকেলে কখনো চড়েছ?

না।

চড়তে আপত্তি আছে?

না আপত্তি নেই।

বাঙালি মেয়েদের সম্পর্কে আমার যে কনসেপ্ট ছিল তার অনেকখানিই তুমি ভেঙে দিয়েছ। মোটর সাইকেলে তুমি আমার পেছনে যাচ্ছ এই দৃশ্য দেখে তোমার বন্ধুরা তোমাকে ক্ষেপাবে না তো?

না ক্ষ্যাপাবে না।

দ্যাটস ভেরী গুড। যেহেতু এই প্রথমবার তুমি মোটর সাইকেলে চড়বে দেখবে তোমার খুবই ভালো লাগবে। বাতাসে চুল উড়বে, শাড়ির আঁচল উড়বে। তোমার একটা ফিলিং হবে তুমি আকাশে উড়ছ। Flying Dutchman. চিন্তা করতেই ভালো লাগছে না?

আমি জবাব দিলাম না। ব্যাপারটা চিন্তা করে আমার মোটেই ভালো লাগছে। না। নিজের ওপর রাগ লাগছে। আমি তো এরকম ছিলাম না। যা মনে এসেছি বলেছি। আজ কেন এরকম হলো? মোটর সাইকেলে চড়তে আমার খুবই আপত্তি আছে। অথচ বললাম, আপত্তি নেই। কেন বললাম? আমিও কি এই ভদ্রলোকের মতোই নিজেকে আলাদা ভাবছি? না তা ভাবছি না। আমি জানি আমি কী। আমি চাচ্ছি যেন এই জ্বলোক মনে করেন আমি আলাদা। আমি বিশেষ কেউ।

স্যার বললেন, মৃন্ময়ী তুমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছ। ব্যাপারটা কী বলো তো?

কোনো ব্যাপার না স্যার।

আমার কী ধারণা জানো? আমার ধারণা তুমি ঝোঁকের মাথায় মোটর সাইকেলে চড়তে রাজি হয়েছিল। এখন ঝোক কেটে গেছে। এখন আর রাজি নও। আমার ধারণা কি ঠিক?

হ্যাঁ ঠিক।

স্যার হাসি মুখে বললেন, আমার আসলে সাইকোলজি পড়া উচিত ছিল। দেখ কত সহজে তোমার মনের অবস্থাটা ধরে ফেললাম। তোমার অস্বস্তি বোধ করার কোনোই কারণ নেই। আমি একদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়ে চা খেয়ে আসব। চা পাওনা রইল। ঠিক আছে?

জ্বি ঠিক আছে। স্যার আমি যাই?

আচ্ছা যাও। তোমাকে আলাদা করে ডেকে এনে ব্রিত করেছিতুমি কিছু মনে করো না।

আমি কিছু মনে করি নি।

আমার ওপর রাগ লাগছে না তো?

লাগছে না।

একটা ব্যাপার জানতে পারলে তুমি অবশ্যি রাগ করবে। ব্যাপারটা না জানানোই ভালো। কিন্তু আমি লোভ সামলাতে পারছি না। বলেই ফেলি।

স্যার তার সামনের টেবিলে পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দেয়া একটা কাগজ বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি প্রথমে আমার পেছনে মোটর সাইকেলে চড়তে রাজি

হবে। তারপর মত বদলাবে। এই ব্যাপারটা আগেই জানতাম। কাগজে লিখে রেখেছি। পড়ে দেখ।

আমি কাগজ হাতে নিলাম। সেখানে পরিষ্কার লেখা— মৃন্ময়ীকে (রোল ফিফটিন) যখন বলা হবে আমার সঙ্গে মোটর সাইকেলে চড়তে সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হবে। পরে বলবে না।

আমি কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলে রেখে স্যারের ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

আমার প্রচণ্ড রাগ লাগছে। নিজেকে ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ মনে হচ্ছে।

কেউ যখন নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে সময়ের সঙ্গে তা বাড়তে থাকে। চারা গাছ যেমন জল হাওয়ায় বিশাল মহীরুহ হয়। ক্ষুদ্রতার ব্যাপারটাও সে রকম। যত সময় যাচ্ছে নিজেকে ততই ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে।

বাসায় ফিরে মনে হলো আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি খুবই সাধারণ একজন। আলাদা কেউ না। সারাজীবন নিজেকে আলাদা ভেবেছি। এই ভাবার পেছনে কোনো কারণ নেই। নিজেকে অন্যরকম ভাবার একটা খেলা খেলেছি। আমি খুব শক্ত ধরনের মেয়ে। কে কী বলল বা কে আমাকে নিয়ে কী ভাবল তা নিয়ে আমি কখনো ভাবি না তা ঠিক না। আমি ভাবি। না ভাবলে স্যারের পেছনে মোটর সাইকেলে চড়তে পারতাম। কোনোই সমস্যা হতো না।

তস্তুরী বেগম আমাকে চা দিতে এসে বলল, আফা আপনের কী হইছে?

আমি বললাম, কিছু হয় নি তো। কেন আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমার জীবনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে?

তস্তুরী বেগম ফিক করে হেসে ফেলে বলল, না গো আফা। আপনেরে বড়ই সৌন্দর্য লাগতেছে।

থ্যাংক য়্যু।

তস্তুরী মাথা নিচু করে হাসছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, হাসছ কেন?

তস্তুরী বেগম নরম গলায় বলল, আমরার গেরাম দেশে একটা কথা আছে। কন্যার যে দিন বিবাহ ঠিক হয় হেই দিন আল্লাহপাক তার রূপ বাড়ায়ে দেন। তিন দান বাড়ে।

বিয়ার কন্যা সুন্দরী
তিন দিয়া গুণন করি।

তার মানে তোমার ধারণা আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে? রূপ তিন গুণ বেড়েছে?

হ আফা।

বিয়ে ঠিক হয় নি তস্তুরী, মন খুব খারাপ হয়ে আছে।

আমার অস্থিরতা কমছে না। একটা সময় ছিল— অস্থির লাগলে ছাদে যেতাম। অস্থিরতা কমতো। এখন তা হয় না। ছাদে গেলে উল্টোটা হয়। অস্থিরতা বেড়ে যায়। মনে হয় ছাদ

থেকে একটা লাফ দিলে কেমন হয়? নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির হাতেনাতে প্রমাণ নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায়। জীবনের শেষ সময়ে একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। পৃথিবী তার মহা শক্তি দিয়ে আমাকে আকর্ষণ করবে, আমিও আমার যেটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে পৃথিবীকে আকর্ষণ করব।

রাতে খাবার টেবিলে বাবা বললেন, তোর কী হয়েছে রে?

আমি বললাম, কিছু হয় নি তো।

তোকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে।

অন্যরকমটা কী?

দেখে মনে হচ্ছে মুখের শেপে কোনো কিছু হয়েছে। চুল কাটার পর ছেলেদের চেহারা যেমন হঠাৎ খানিকটা বদলে যায় সেরকম। চুলে কি কিছু করেছিস?

না, চুলে কিছু করি নি। আমার খুব বেশি মন খারাপ। মন খারাপ হলে হয়তো মানুষের চেহারা বদলায়।

মন খারাপের কারণ কী?

তেমন কোনো কারণ নেই।

আমাকে বলা যাবে না?

বলার মতো কিছু হয় নি।

আমাকে বলতে না চাইলে তোর মাকে বল। Open up. মন খারাপের ব্যাপারটা হলো একটা খারাপ গ্যাসের মতো। দরজা জানালা বন্ধ ঘরে এই গ্যাসটা আটকে থাকে। কাউকে মন খারাপের কথা বললে বন্ধ ঘরের জানালা খুলে যায়। তখন গ্যাসটা বের হতে পারে। জানালা খুলে দে।

বাবাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে। জ্ঞানের কথা বলতে পারার আনন্দ। শিক্ষক হবার এই সমস্যা–জ্ঞানের কথা বলতে ইচ্ছা করে। উদাহরণ দিয়ে কোনো জ্ঞানের কথা বলতে পারলে ভালো লাগে। বাবা তার চেহারায় ভালো লাগা ভাব নিয়ে বললেন, মৃন্ময়ী ইদানীং টগর কী করছে না-করছে সে সম্পর্কে কিছু জানি।

আমি বললাম, না।

কম্পিউটারের কোন স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, সেটা তো যতদূর জানি সে করছে। না।

ভাইয়ার চোখে সমস্যা। সে কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না।

চোখে সমস্যা এইসব ভুয়া কথা। কোনো কিছু করার প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। সে ধরেই নিয়েছে বাবার মৃত্যুর পর বিরাট বিষয়সম্পত্তির মালিক হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে যাবে। তার চিন্তাটা ঠিক না। যে অপদার্থ তাকে আমি কিছু দিয়ে যাব না। তাকে পথে পথে ঘুরতে হবে। এই কথাটা তাকে বুঝিয়ে বলিস তো।

তুমি বুঝিয়ে বলো। তুমি শিক্ষক মানুষ। উদাহরণ দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারো। আমি পারি না। এই তো একটু আগে গ্যাস নিয়ে কথা বললে। জানালা খুললে গ্যাস বের হয়ে যাবে – এইসব উদাহরণ তো আমি জানি না।

বাবা আহত চোখে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে তিনি মন খারাপ করেছেন। যে মানুষটার মন খারাপ সে তার মন খারাপটা ছড়িয়ে দিতে চায় অন্যদের ভেতর। যার মন উফুল্ল সে চায় তার ফুল্ল ভাব ছড়িয়ে দিতে। আমি ঠিক এই কাজটাই করছি। জেনে শুনে করছি তা না। নিজের অজান্তেই করছি। যে মস্তিস্ক আমাদের পরিচালনা করছে সে করিয়ে নিচ্ছে। আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তার হাতে। মানুষ স্বাধীন না, সে তার মস্তিষ্কের অধীনে বাস করে।

রাতে ঘুমোতে যাবার আগে ভাইয়ার ঘরে উকি দিলাম। জানালা দিয়ে উকি। এটা আমার নিয়মিত রুটিনে পড়ে না। কাজটা কেন করলাম? ঘুমোনার আগে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার জন্যে। তা তো না। ভাইয়া গল্প করতে পারে না। কিছু বললে ঠোট চেপে হাসে। মাঝে মধ্যে মাথা দোলায়। তাহলে কি আমার অবচেতন মন এই ঘরে কিছু খুঁজছে? ভাইয়ার বন্ধুকে আমি খুঁজছি?

ভাইয়ার ঘরের দরজা ভেজানো। ভেতরটা যথারীতি অন্ধকার। ঘরের ভেতর ভাইয়া ছাড়া দ্বিতীয় কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। ভাইয়া বড় বড় করে শ্বাস ফেলছে এটা শোনা যাচ্ছে। ঘুমন্ত মানুষ বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে। ভাইয়া হয়তো ঘুমুচ্ছে।

মৃ! জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিস কেন?

আমি ভাইয়ার কথা শুনে জানালা থেকে সরে এসে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, তোমার ঘরে কেউ লুকিয়ে আছে কি-না দেখতে এসেছি।

বাবা পাঠিয়েছেন?

কেউ পাঠায় নি, আমি নিজেই এসেছি।

অন্ধকার ঘরে দেখবি কী? বাতি জ্বালিয়ে দেখ। খাটের নিচে উঁকি দে।

তোমার ঐ বন্ধু আর আসে নি?

কোন বন্ধু?

নাম তো আমি জানি না। মাথায় কোঁকড়া চুল। মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ির ছাদে ঘুমায়। যাকে পুলিশ খুঁজছে।

ও আচ্ছা!

তার নাম কী?

ভাইয়া হাসল। নাম বলতে তার বোধহয় কোনো সমস্যা আছে।

আমি তো ভাইয়া পুলিশের কোনো ইনফরমার না। নাম বলতে তোমার সমস্যা কী?

কোনো সমস্যা নেই। বোস, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোর ডান দিকেই চেয়ায় দেখতে পাচ্ছিস নাকি বাতি জ্বালতে হবে?

দেখতে পাচ্ছি। ভাইয়া, তোমার ঐ কোঁকড়া চুলের বন্ধু ও কি খুবই ভয়ঙ্কর?

হ্যাঁ ভয়ঙ্কর।

ও করে কী?

এমনিতে কিছু করে না। দিন রাত মন খারাপ করে থাকে। কেউ মজার কোনো কথা বললে খুব মজা পায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ করে ফেলে। পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। এসএসসি-তে ঢাকা বোর্ডে ফিফথ প্লেস পেয়েছিল। কলেজে ওঠার পর আর পড়াশোনা হয় নি।

এটা তো তার কোনো পরিচয় হলো না ভাইয়া। আমি জানতে চাচ্ছি ও করে কী? কেন ভয়ঙ্কর?

ও ভাড়া খাটে।

ভাড়া খাটে মানে?

যে কেউ তাকে ভাড়া করতে পারে। মনে কর, কেউ খারাপ কিছু কাজ করতে চায়, নিজে করতে পারছে না ওকে ভাড়া করে নিয়ে গেল।

খারাপ কাজটা কী রকম?

মানুষ খুন?

হ্যাঁ।

টাকা দিলেই সে মানুষ খুন করবে।

হ্যাঁ করবে।

মানুষ খুন করতে সে কত টাকা নেয়?

জানি না। আমি জিজ্ঞেস করি নি।

তোমার এত প্রিয় বন্ধু, রাতে তোমার সঙ্গে থাকতে আসে আর তুমি কিছু জিজ্ঞেস করো নি?

ভাইয়া হাসল। মজার কোনো কথা শুনলে মানুষ যেভাবে হাসে ঠিক সেরকম হাসি। আমি বললাম, ভাইয়া আমি যদি তোমার ঐ বন্ধুকে বলি– এই নিন টাকা, আমি অমুক লোকটাকে খুন করতে চাই। সে করবে?

করার তো কথা।

এরকম বন্ধু তোমার কজন আছে?

ভাইয়া আবারও হাসল। যেন আবারও আমি মজার কোনো কথা বলেছি।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তোমার ওদের মতো হতে ইচ্ছে করে না?

না। ওরা আমার মতো হয় না। আমিও ওদের মতো হই না। যা, ঘুমুতে যা।

কেউ কি আসবে তোমার কাছে?

ভাইয়া চুপ করে রইল। আমি বললাম, তুমি কিন্তু এখনো ঐ ছেলের নাম বলো নি।

ভাইয়া আবারও বলল, যা ঘুমুতে যা।

আমি ঘুমুতে গেলাম এবং আশ্চর্যের কথা খুবই সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখলাম কাওসার স্যার মোটর সাইকেল চালাচ্ছেন। আমি মোটর সাইকেলের পেছনে বসে আছি। হাওয়ায় আমার মাথার চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে। মোটর সাইকেল প্রায় উড়ে যাচ্ছে। আমার মোটেই ভয় লাগছে না। তার পরেও কপট ভয়ের অভিনয় করে বলছি এই তুমি কি একটু আস্তে চালাতে পারে না? স্যার বললেন, না, পারি না।

আমি বললাম, ছিটকে পড়ে যাব তো।

স্যার বললেন, পড়বে না। আমার কোমর জড়িয়ে ধরে শক্ত হয়ে বসে থাক। আমি কিন্তু স্পিড আরো বাড়াচ্ছি। রেডি। গেট সেট গো। এমন স্পিড দেব যে মোটর সাইকেল নিয়ে আকাশে উড়ে যাব।

স্যারের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মোটর সাইকেল সত্যি সত্যি আকাশে উঠে গেল। ওপর থেকে নিচের ঢাকা শহর দেখা যাচ্ছে। আমার সামান্য ভয় ভয় লাগছে। তবে ভয়ের চেয়ে আনন্দ হচ্ছে অনেক বেশি।

ভয়ঙ্কর ভয়ের স্বপ্নে মানুষের ঘুম ভাঙে, আবার অস্বাভাবিক আনন্দের স্বপ্নেও মানুষের ঘুম ভাঙে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে ভাবলাম কেন এরকম স্বপ্ন দেখলাম? আমি কি একপলকের দেখাতেই একটা মানুষের প্রেমে পড়ে গেছি? প্রেম এত সস্তা?

৩. রাত দেড়টা বাজে

রাত দেড়টা বাজে।

বেশির ভাগ মানুষের জন্যেই গভীর রাত— আমার জন্যে রজনীর শুরু। ডিজাইনের মূল কাজগুলো আমি এই সময় শুরু করি। আগামীকাল ডুপলেক্স বিল্ডিং-এর ফটোগ্রাফ দিয়ে করা একটা কোলাজ জমা দিতে হবে। বিল্ডিং-এর। ফটোগ্রাফ সাজানো হয়েছে। এদের মাঝখানে ফাক ভরার জন্যে রং দিতে হবে। রং তৈরির কাজটা রাত যত গভীর হয় তত ভালো হয়। দিন হলো কাজের সময়, প্রয়োজনের কাজ যেমন–ব্যবসা বাণিজ্য, অফিস আদালত। রাত হলে অপ্রয়োজনের কাজের সময়। কবিতা লেখা হবে, ছবি আঁকা হবে। ঔপন্যাসিক চোখ বন্ধ করে তাঁর চরিত্রদের নিয়ে খেলা করবেন। সাধু সন্তরা বসবেন ধ্যানে।

জীবনানন্দ দাশ নিশ্চয়ই চৈত্র মাসের দুপুরে গরমে ঘামতে ঘামতে লিখেন

নি

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি
সারারাত দখিনা বাতাসে।
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাই হরিণীর ডাক শুনি,
কাহারে সে ডাকে।

আমার ধারণা এই লাইনগুলো তিনি লিখেছেন মধ্যরাত পার করে। তখন চারদিকে সুনসান নীরবতা। বরিশালে তাঁর বাড়ির পাশের বাঁশঝাড়ের বাঁশ পাতা বাতাসে কাঁপছে। এবং তিনি কল্পনায় বনের ভেতর ঘাই হরিণীর ডাক স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন।

আচ্ছা, ঘাই হরিণী ব্যাপারটা কী? চিত্রা হরিণ, শাম্বা হরিণ আছে। ঘাই হরিণ কোথেকে এসেছে। ঘাই কি নাম, নাকি বিশেষণ?

কাওসার স্যার ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ড বড় বড় করে তাঁর টেলিফোন নাম্বার লিখে বলেছিলেন, ডিজাইন সংক্রান্ত কোনো জটিলতায় তোমরা যদি পড় তাহলে এই নাম্বারে যে-কোনো সময় আমাকে টেলিফোন করতে পারো। রাত দুটা, তিনটা, চারটা কোনো সমস্যা নেই।

আমি এখন ডিজাইন সংক্রান্ত জটিলতাতেই পড়েছি। মাথার ভেতর থেকে ঘাই শব্দ দূর না করা পর্যন্ত কাজে মন দিতে পারছি না। কাজেই স্যারকে টেলিফোন করার অধিকার আমার আছে। আমি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললাম। অধিকার কাজে লাগানো ঠিক হবে না। সব অধিকার কাজে লাগাতে নেই। তারচে মন অন্যদিকে নেবার ব্যবস্থা করা যাক।

আমি হাতে রিমোট কনট্রোল নিয়ে সিডি প্লেয়ার চালু করলাম। ঝড় বৃষ্টির একটা সিডি চালু হয়ে গেল। এই সিডিটা জন্মদিনে ফরিদা আমাকে দিয়েছে। গান বাজনা কিছু নেই শুধুই সাউন্ড এফেক্ট। বাতাসের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, মাঝে মাঝে বজ্রপাতও হচ্ছে। স্টুডিওতে তৈরি শব্দ না। মন্টানার এক বনের ভেতরে রেকর্ড করা ঝড়ের শব্দ। সিডির গায়ে সেরকমই লেখা। শুনতে ভালো লাগে।

টেলিফোন বাজছে। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। একটা চল্লিশ। এত রাতে টেলিফোন করার মতো আমার কেউ নেই। ট্র্যাংক কল হবার সম্ভাবনা। রিসিভার তুলতেই মার আবদারি গলা শুনা গেল— মৃ আজ আমি তোর সঙ্গে ঘুমাব।

আমি বললাম, আচ্ছা।

টেলিফোনের রিং পেয়ে কী ভেবেছিলি?

কিছু ভাবি নি মা।

পাশের কামরা থেকে আমি টেলিফোন করেছি এটা নিশ্চয়ই ভাবিস নি।

না তা ভাবি নি। আমার ঘরে ঘুমুলে চাইলে চলে এসো। তবে আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না। তুমি ঘুমাবে তোমার মতে, আমি বাতি জ্বালিয়ে কাজ করব।

মৃ তোর ঘর থেকে ঝড়ের শব্দ আসছে কেন?

ঝড়ের সিডি বাজছে এই জন্যে ঝড়ের শব্দ।

ঝড়ের সিডি আবার কী?

এসে শুনে যাও কী। এক্সপ্লেইন করতে পারব না।

তুই এত বিরক্ত হচ্ছিস কেন? সবাই দেখি আমার কথা শুনলে বিরক্ত হয়। আমার বাবা-মার ফ্যামিলির সবাই হয়। তোর বাবা হয়। তুই হোস। ব্যাপার কী?

টেলিফোনে এত কথা শুনতে ভালো লাগছে না মা। তুমি আসতে চাইলে চলে এসো।

আমার তো টেলিফোনে কথাবার্তা চালাতে খুবই ভালো লাগছে। খুব যারা ঘনিষ্ঠ তাদের মাঝে মাঝে উচিত টেলিফোনে কথা বলা। টেলিফোনে গলার শব্দ বদলে যায় তো– পরিচিত জনকে তখন মনে হয় অপরিচিত। খুব পরিচিত জনের সঙ্গে যত কথা বলা যায় মোটামুটি পরিচিত জনের সঙ্গে তারচে বেশি কথা বলা যায়। হ্যালো তুই কি টেলিফোন রেখে দিয়েছিল?

না।

মা গলার আওয়াজ নামিয়ে ফিসফিস পর্যায়ে নিয়ে এসে বললেন, তোকে টেলিফোন করার সময় মজার একটা কাণ্ড হয়েছে। তোর বাবা হঠাৎ ঘরে ঢুকেছে। কিছুক্ষণ ভুরু টুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেছে।

এতে মজার কী হলো?

ওমা মজার না! তোর বাবা ভাবছে— গভীর রাতে হাসিহাসি মুখে কার সঙ্গে কথা? রহস্যটা কী? তোর বাবার মনে একটা কিন্তু তৈরি হয়েছে।

বাবার মনে এত সহজে কিন্তু তৈরি হয় না। বাবা এত রাত পর্যন্ত জেগে আছে কেন?

কয়েক রাত ধরেই তো এই অবস্থা। ঘুমাচ্ছে না, জেগে থাকছে। একটু পরপর বিছানা থেকে উঠে পানি খায়। কিছুক্ষণ বই পড়ার চেষ্টা করে, কিছুক্ষণ লেখার টেবিলে বসে হিসাব নিকাশ করে। বাকি সময়টা বারান্দায় হাঁটাহাটি করে।

কী ব্যাপার, তুমি কিছু জিজ্ঞেস করো নি?

না। আমি কোনো প্রশ্ন করলেই তো তোর বাবা রেগে যায়। কী দরকার তাকে রাগিয়ে! মৃ তোর সিডি বন্ধ হয়ে গেছে, আবার দে। টেলিফোনে শুনছি তো আওয়াজটা রিয়েল মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই ঝড় হচ্ছে। একটু আগে যে মট করে শব্দ হলে সেটা কি গাছ ভাঙার শব্দ? টেলিফোনে না শুনে সিডি প্লেয়ারের সামনে বসে যখন শুনব তখন আর রিয়েল মনে হবে না। এটা নিয়ে তোর সঙ্গে বাজি ধরতে পারি।

মা শোনো, টেলিফোন কানের কাছে ধরে ধরে কান ব্যথা করছে। তুমি আসতে চাইলে আস– একটাই শর্ত আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রেখে হতাশ নিঃশ্বাস ফেললাম। আজ রাতের কাজের এখানেই ইতি। মা আমার ঘরে এসে সুবোধ বালিকার মতো ঘুমিয়ে পড়বেন তা কখনো হবে না। তার প্রধান চেষ্টাই থাকবে আমার সঙ্গে গল্প। করা। সেইসব গল্পেরও কোনো আগা মাথা নেই। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গল্পগুলি লাফিয়ে যাবে। ইদানীং গল্পের নতুন এক প্রশাখা যুক্ত হয়েছে। প্যাকেজ নাটক বানায় এমন একজন মা-কে বলেছে তার নাটকে বড় খালার ভূমিকায় অভিনয় করতে। ভদ্রলোক নাটকের স্ক্রীপ্টও মা-কে দিয়েছেন। মার সব গল্প এখন বড় খালার চরিত্রে গিয়ে পড়ছে।

কিছু কিছু মানুষের মনে হয় মনের বয়স বাড়ে না। কিশোরী অবস্থায় মার মন যেমন ছিল— এখননা সে রকমই আছে। শরীর বুড়িয়ে যাচ্ছে। চামড়ায় ভাজ পড়ছে, চোখের নিচ ঝুলে পড়ছে। মাথার চুল পাকতে শুরু করছে। মা নানান রকম ক্রিম ঘষাঘষি শুরু করেছেন। ভিটামিন E ক্রিম। জয়পুরের মাটি দিয়ে মাড ট্রিটমেন্ট। চন্দন বাটার প্রলেপ জিনিসগুলো যে একেবারেই কাজ করছে। না তা না। মাঝে মাঝে মার বয়স খুবই কম মনে হয়। কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী, কিংবা ইউনিভার্সিটিতে সদ্য ভর্তি হয়েছে এ রকম মনে হয়। তবে ব্যাপারটা খুবই অল্প সময়ের জন্যে ঘটে। আমার ধারণা এটা প্রকৃতির একটা খেলা। প্রকৃতি মাঝে মাঝে বয়স্ক মানুষের চেহারা থেকে বয়সের সব চিহ্ন সরিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে তারুণ্য দিয়ে এক ধরনের বিভ্রম তৈরি করে। বিভ্রম তৈরির খেলা প্রকৃতির খুবই প্রিয় খেলা।

মার এর মধ্যে চলে আসার কথা। তিনি আসছেন না। হয়তো মত বদলেছেন। টেলিফোন রিসিভার হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি হাতের রং মুছে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বারান্দার শেষ মাথায় বেতের চেয়ারে পা তুলে বাবা বসে আছেন। তাঁকে আসবাবপত্রের মতো মনে হচ্ছে। কাওসার স্যার ক্লাসে বলেছেন চোখ খোলা রাখবে। যা দেখবে চোখ খোলা রেখে দেখবে। তাহলে বুঝবে ফার্নিচারকে মাঝে মাঝে জীবন্ত মনে হবে। আবার কিছু কিছু মানুষকে ফার্নিচার মনে হবে।

স্যারের অনেক কথাই ঠিক না। তবে একটা কথা একশ ভাগ ঠিক।

মানুষ নিজেকে Conditioned করে নিতে পছন্দ করে। বারান্দার শেষ মাথায় তিনটা বেতের চেয়ার আছে। বাবা বসে আছেন মাঝেরটায়। এই চেয়ার ছাড়া তাঁকে কখনো অন্য

চেয়ারে আমি বসতে দেখি নি। আমি এগিয়ে গেলাম। বাবা আমাকে দেখে নড়েচড়ে বসলেন। তিনি মনে হলে আমাকে আসতে দেখে খুশি হয়েছেন। অদ্রিার রোগী যখন রাত জাগে তখন যে-কোনো জাগ্রত মানুষকে দেখে খুশি হয়

আমি হালকা গলায় বললাম, বাবা, তোমার খবর কী?

কোনো খবর নেই।

ঘুম আসছে না।

না।

কেন ঘুম আসছে না?

জানি না কেন আসছে না।

ঘুমের অষুধ খেয়েছ?

পাঁচ মিলিগ্রাম ডরমিকাম খেয়েছি। কিছুক্ষণের জন্যে ঝিমঝিম ভাব এসেছিল– কেটে গেছে।

কোনো বিশেষ কিছু নিয়ে তুমি কি টেনশন করছ?

না।

ব্যবসা ভালো চলছে?

ভালো চলছে না, তবে টেনশান করার মতো কিছু না।

বসব তোমার পাশে?

বোস।

তাহলে একটা কাজ করো বাবা তুমি মাঝখানের চেয়ারটা ছেড়ে অন্য যে-কোনো চেয়ারে বস। মাঝখানের চেয়ারটা আমাকে ছেড়ে দাও।

বাবা কোনো প্রশ্ন করলেন না। মাঝের চেয়ারটা ছেড়ে দিলেন। আমি বসতে বসতে বললাম, আজহার চাচার আনা কাফনের কাপড়টা কি তোমার মধ্যে কোনো সমস্যা তৈরি করেছে?

না।

আমার নিজের কিন্তু ধারণা করেছে। তোমার ঘুম না হওয়া রোগ শুরু হয়েছে এর পরই। এক কাজ করো কোনো ভিখিরিকে কাপড়টা দিয়ে দাও। কাফনের কাপড় এটা বলে দিতে হবে না বলো যে পায়জামা পাঞ্জাবি বানানোর জন্যে কাপড়। আজহার চাচার আনা এই বিশেষ বস্তুটা তুমি কেন। সিরিয়াসলি নিচ্ছ?

বাবা বিরক্ত গলায় বললেন, আজহার একটা গাধা। আমি কোন দুঃখে তার কথা সিরিয়াসলি নেব। গাধাটা গতকাল দুপুরে আমার অফিসে এসেছিল। কী বলতে এসেছিল জানিস? সে

বনানী গোরস্তানে তার এবং তার স্ত্রীর কবরের জন্যে জায়গা কিনেছে। দুই লাখ টাকা লেগেছে। মহাআনন্দে এই খবর দিতে এসেছে। যেন রাজ্য জয় করেছে।

আমি বললাম, তাঁর কাছে এই খবরটা গুরুত্বপূর্ণ বলেই তিনি এসেছেন। সবাই পৃথিবীটাকে দেখবে তার নিজের মতো করে। সেই দেখা ভুলও হতে পারে আবার শুদ্ধও হতে পারে। তোমার বন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে তোমার রাগ করা সাজে না। উনি গোরস্তানে জায়গা কিনছেন তাতে তুমি কেন রাগবে?

বাবা থমথমে গলায় বললেন, আমি রাগব কারণ গাধাটা আমার জন্যেও জায়গা কিনতে চায়। আমার কাছে এসেছিল এই জন্যে। জায়গার না-কি খুব টানাটানি। এখন না কিনলে পরে আর পাওয়া যাবে না। আজিমপুর গোরস্তানে যে অবস্থা হয়েছে। এখন আর জায়গা বিক্রি হচ্ছে না। ব্যাক ডোর দিয়ে জায়গা কেনাও বন্ধ। কিনলে এখনি কিনতে হবে।

তুমি কী বললে?

আমি বলেছি–কবরের জন্যে জায়গা কেনা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার কবর কোথায় হবে সেটাও ঠিক করা হয় নি। দেশের বাড়িতে হতে পারে। আমি খুব কঠিন গলায় আজহারকে বলেছি আমার কবরের জায়গা নিয়ে সে যেন মাথা না ঘামায়।

উনি মাথা ঘামালে ঘামাক। তুমি মাথা ঘামিও না। তুমি তোমার মতো থাকে।

তাই তো আছি।

না তা নেই। তুমি খুবই আপসেট হয়ে পড়েছ। এখন দয়া করে ডাউনসেট হও।

ডাউনসেটটা কী?

ডাউনসেট হলো আপসেটের উল্টোটা। বারান্দায় বসে না থেকে চোখে মুখে পানি দিয়ে শুয়ে পড়।

আমি বাবার ডান হাতটা ধরে নিজের কোলে রাখলাম। তিনি মনে হলে একটু লজ্জা পেয়ে গেলেন। আমার কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার পেয়ে তিনি অভ্যস্ত না। আমি আবারো বললাম, বাবা যাও ঘুমুতে যাও।

বাবা ক্লান্ত গলায় বললেন, বসি আরো কিছুক্ষণ। ঘুমের প্রথম স্পেলটা কেটে গেলে সমস্যা আছে। এখন বিছানায় গেলে কাজের কাজ কিছু হবে না। তুই শুয়ে পড়।

আমার ঘুমুতে দেরি আছে। প্রজেক্ট শেষ করতে হবে। কাল জমা দেবার শেষ দিন।

রাত তিনটায় ঘুমুতে গিয়ে সকাল নটায় ক্লাস ধরতে অসুবিধা হয় না?

না হয় না। অভ্যাস হয়ে গেছে। কফি খাবে বাবা? মধ্যরাতের কফির অন্য এক মজা আছে।

এমিতেই ঘুম হচ্ছে না–এর ওপর কফি?

বিষে বিষক্ষয়–হয়তো দেখবে কফি খেয়ে তোমার ঘুম পেয়ে যাবে। আমাদের নতুন একজন টিচার এসেছেন কাওসার নাম উনি সারাদিনে একটা সিগারেট খান। কখন খান জানো?

ঠিক ঘুমুতে যাবার আগে। সিগারেট হচ্ছে তার ঘুমের ট্যাবলেট। সিগারেট অর্ধেক শেষ হবার আগেই ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে যায়। এমনও হয়েছে জ্বলন্ত সিগারেট তাঁর মুখে, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। সিগারেটের ছাকা খেয়ে তাঁর ঘুম ভেঙেছে।

তোদের টিচাররা কি ক্লাসে এইসব গল্প করে?

হ্যাঁ করে। আমাদের ক্লাসগুলো অন্যরকম Creativity class. এখানে কোনো নিয়ম নেই। নিয়ম না থাকাটাই আমাদের নিয়ম।

ভালো। যা কফি নিয়ে আয়।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। রান্নাঘরে যাবার আগে এক তলায় ভাইয়ার ঘরে উঁকি দিলাম। ভাইয়া গভীর ঘুমে। তার ঘরের দরজা খোলা। সে কখনো দরজা বন্ধ করে ঘুমুবে না। দরজা জানালা বন্ধ করলেই তার কাছে না-কি মনে হয় ঘরের বন্ধ দরজা জানালা আর খোলা যাবে না। কোনো কারণে আটকে যাবে। এই মনে করে তার দম বন্ধ হয়ে আসে এবং এক সময় নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়।

ভাইয়া জেগে থাকলে ভালো হতো। তাকে তার বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করতাম। নতুন কোনো এসাইনমেন্ট সে হাতে নিয়েছে কি-না। কত টাকার এসাইনমেন্ট। ছেলেটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে মন্দ হতো না। আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম আবার কোনোদিন রাতে সে যদি ছাদে ঘুমুতে আসে তাহলে তাকে কয়েক লাইন কবিতা শুনিয়ে বলব। এর মানে কী বলুন। তো।

পুলিশ আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে বলুন দেখি এই দুটা লাইনের কী অর্থ–

অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষন্ন সময়
পৃথিবীরে মায়াবী নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।

মগ ভর্তি কফি নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দেখি বিছানায় এলোমেলো হয়ে মা ঘুমুচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে চিন্তা ভাবনাহীন কিশোরী এক মেয়ে বড় বনের সঙ্গে ঘুমুতে এসেছে। তার আশা ছিল সে বোনের সঙ্গে স্কুলের কিছু মজার মজার কথা বলবে। আশা পূর্ণ হয় নি। বোন কাজ করছে। ছোট কিশোরী বিছানায় শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে কখন বড় বোনের কাজ শেষ হবে। কখন বড় বোন বাতি নিভিয়ে বিছানায় আসবে। অপেক্ষা করতে করতে বেদারি ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোলাজের কাজ শেষ হলো রাত সাড়ে তিনটায়।

চোখে মুখে পানি দিয়ে বাতি নিভিয়ে আমি মার পাশে জায়গা করে শুয়ে পড়লাম। মা সহজ গলায় বললেন–ঝড়ের ক্যাসেটটা দিয়ে দে। ঝড় বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমাই।

আমি বললাম, তুমি এতক্ষণ জেগেছিলে?

হুঁ, ছিলাম।

এতক্ষণ কি ঘুমের অভিনয় করছিলে?

হুঁ, করছিলাম। অভিনয়টা ভালো হয়েছে না? বড় খালার পাটটা করলে মনে হয় ভালোই পারব, কী বলিস?

নাটকের অভিনয়ের কথা বাদ দাও। নাটক ছাড়া এ রকম অভিনয় কি তুমি প্রায়ই করো?

হুঁ, করি। তোর বাবা কিছু বুঝতে পারে না।

আশ্চর্যতো!

আশ্চর্য হবার কী আছে? মেয়ে হয়ে কেউ জন্মাবে আর অভিনয় করবে না, এটা হতেই পারে না।

আমি কোনো অভিনয় করি না মা।

তুই তাহলে মহা বিপদে পড়বি।

বিপদে পড়লে পড়ব। আচ্ছা মা দেখি তোমার কেমন বুদ্ধি। আমি কবিতার দুটা লাইন বলব তুমি এর কী অর্থ বলবে।

মা বিরক্ত গলায় বললেন, ঘুমাতে! বুড়ো বয়সে বাংলার পরীক্ষা দিতে পারব না।

আহা চেষ্টা করে দেখই না! কবিতার লাইন দুটা হলো–

অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষন্ন সময়
পৃথিবীরে মায়াবী নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।

মা হাই তুলতে তুলতে বললেন, জীবনানন্দ দাশের কবিতা না? অবসরের গান। এই কবিতার সবচে সুন্দর লাইনটা কী জানিস? সবচে সুন্দর লাইন–

এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমাবার
সাধ ভালোবেসে।

মা চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরলেন। আমি অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মা ঘুমুচ্ছ?

হ্যাঁ ঘুমুচ্ছি।

তুমি আমাকে খুবই অবাক করেছ।

মাঝে মাঝে অবাক হওয়া খারাপ না।

তুমি চোখ বন্ধ করে আছো কেন? এসে গল্প করি। রাত তত বেশি বাকি নাই। এসে গল্প করে রাতটা পার করে দেই।

কী নিয়ে গল্প করবি?

তোমার যা ইচ্ছা। বড় খালার যে রোলটা করতে চাচ্ছ সেটা নিয়েও কথা বলতে পারি। রোলটা কেমন?

একটা মাত্র ডায়ালগ। আমি বসেউলের মোজা বানাচ্ছি, তখন নায়িকা এসে বলবে খালা কার জন্যে মোজা বানাচ্ছ? তার উত্তরে আমি বলব–জানি না। তখন নায়িকা বলবে তুমি মোজা বানাচ্ছ অথচ বলছ কার জন্যে মোজা বানাচ্ছ। জানোনা এটা কোন কথা? তার উত্তরে আমি রহস্যময় হাসি হাস।

রহস্যময় হাসি প্রাকটিস করেছ?

না।

আমি দেখিয়ে দেব কোনো সমস্যা নেই।

মা চিন্তিত গলায় বললেন, রহস্যময় হাসি আমি নিজেও পারব। আসল সমস্যা অন্য খানে উলের মোজা তো বানাতে পারি না। জীবনে কোনোদিন উলের কাঁটাই হাতে নেই নি।

মোজা বানানো শিখে নাও। বয়স্ক মহিলারা সবাই উলের মোজা বানাতে পারে। ওদের কাছে গেলেই পারো।

অভিনয় করছি এটা শুনে তোর বাবা আবার রাগ করবে না তো?

তোমার শখ হয়েছে তুমি অভিনয় করছ। বাবার তো এখানে রাগ করার কিছু নেই। বাবা যখন তার শখ মেটানোর জন্যে কিছু করে তখন তো তুমি রাগ করো না।

মা বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন, পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। একজন পুরুষের রাগ করার যতটা অধিকার, একজন মেয়ের কিন্তু ততটা অধিকার নেই।

তার মানে?

মনে কর ভোর বাবার হঠাৎ শখ হলো একটা চা বাগান কিনবে। সে কিনে ফেলল। আমাকে কিছুই বলল না। আমি কিন্তু তাতে রাগ করতে পারব না। সে যদি সেই চা বাগানে তার অফিসের কোনো মহিলা কর্মচারীকে নিয়ে যায়, সপ্তাহে দু একদিন কাটিয়ে আসে তাতেও কিন্তু আমি রাগ করতে পারব না। কারণ সে গিয়েছে অফিসের কাজে। তাকে চিঠি লিখতে হবে। দেশের বাইরের যারা চা পাতা কিনবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অসংখ্য মানুষকে টেলিফোন করতে হবে। টেলিফোন রিসিভ করতে হবে।

বাবা কি চা বাগান কিনেছে না-কি?

উদাহরণ দিচ্ছিরে মা। উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর জন্যে চা বাগানের কথাটা বললাম। তোদর ইউনিভার্সিটির টিচাররা জটিল বিষয় উদাহরণ দিয়ে সহজ করে না? আমিও করেছি।

মা হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলে বললেন উদাহরণ দিয়ে বুঝানো নিয়ে খুবই অশ্লীল একটা জোক আছে। অশ্লীল হলেও দারুণ হাসির। তার বিয়ে হোক তারপর বলব।

বিয়ে হোক আর না হেকি তোমার মুখ থেকে অশ্লীল রসিকতা শোনার আমার কোনো ইচ্ছা নেই।

মা আবার শুয়ে পড়লেন। আমি মায়ের গায়ে হাত রেখে বললাম, ঘাই হরিণী কী তুমি জানো?

মা হাই তুলতে তুলতে বললেন, জানি। কিন্তু তোকে বলা যাবে না। ঘাই হরিণী ব্যাপারটাও অশ্লীল। মা হয়ে আমি মেয়ের সঙ্গে অশ্লীল কথা বলব? ভাবিস কি তুই আমাকে? আমি কি জীবনানন্দ দাশ।

মা হঠাৎ বালিশে মুখ গুঁজে হাসতে শুরু করলেন। আমি বললাম, হাসছ কেন?

হাসি আসছে এই জন্যে হাসছি।

কেন হাসি আসছে জানতে পারি?

তুই নাকি একজনের প্রেমে পড়েছিস এই ভেবে হাসি আসছে।

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, আমি কারো প্রেমে পড়ি নি। আর যদি পড়েও থাকি এখানে হাসির কী হলো?

কোনো ছেলের প্রেমে পড়িস নি? আমাকে যে বলল তোদের একজন টিচারের সঙ্গে তোর প্রেম হয়েছে। সবাই তাকে গরু স্যার ডাকে। হি হি হি।

হাসি থামাও তো মা। এইসব কে বলেছে?

ঐ দিন ফরিদাদের বাসায় গিয়েছিলাম। সে বলল।

আমি চুপ করে গেলাম। মার অনেক বিচিত্র স্বভাবের একটা হলো আমার সব বান্ধবীর সঙ্গে তার খুব ভালো যোগাযোগ। তিনি নিয়মিত তাদের বাসায় যাবেন। সমবয়সীদের মতো হৈচৈ করবেন এবং ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে গোপন রাখবেন।

মা হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, মৃন্ময়ী তুই তোর গরু স্যারকে একদিন বাসায় নিয়ে আসিস তো। আমি লন থেকে কাঁচা ঘাস কেটে রাখব। হি হি হি।

মা পাগলের মতো হাসছেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে মা মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ না।

মৃন্ময়ী!

বলো।

আমার মনে হচ্ছে তার বিয়ে হবে আজহার সাহেবের ছেলের সঙ্গে। আমার সিক্সথ সেন্স তাই বলছে। বিয়েটা যেহেতু ঠিক হয়েই আছে কাজেই গরু স্যারের সঙ্গে প্রেমটা না হলেই ভালো হয়। টিচার মানুষ হাফসোল খাবে। কাজটা ঠিক হবে না।

মা, চুপ করো তো!

এই রসিকতা মা প্রায়ই করে। আজহার চাচার ছেলেটাকে নিয়ে রসিকতা। ছেলেটা জড়ভরতের মতো। মানসিকভাবে হয়তোবা সামান্য অসুস্থ। কোথাও বসে আছে তো বসেই আছে। কোনো দিকে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে।

ছোটবেলায় আমাদের বাসায় আসত। ঘরের কোনো অন্ধকার কোণ খুঁজে বসে থাকত। কোনো প্রশ্ন করলে জবাব দিত না। শুধু যদি মা বলতেন, এই শোন মৃন্ময়ীকে বিয়ে করবি?

সে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে নরম গলায় বলত, করব।

মা হেসে ভেঙে পড়তেন। রাগে আমার গা জ্বলে যেত। এখনো রাগ লাগছে। মানুষের অসুস্থতা নিয়ে রসিকতা করার কোনো মানে হয় না।

মা বললেন, তোর আজহার চাচার এই ছেলে তো খারাপ না। স্বামী হিসেবে আদর্শ হবে। যেখানে বসিয়ে রাখবি বসে থাকবে। তোর দিকে প্রেমপূর্ণ নয়নে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে। খেতে দিলে খাবে। খেতে না দিলে খাবে না। হি হি হি।

আমি কঠিন গলায় বললাম, মা প্লিজ হাসবে না।

মা বললেন, আজহার সাহেবকে তোর বাবা চিনতে পারে নি। আজহার সাহেব কচ্ছপ রাশি। কচ্ছপ রাশির মানুষ একবার কোনো কিছু কামড়ে ধরলে ধরেই থাকবে। দেখিস সে ঠিকই তোর বাবার কাছে কবরের জায়গা বিক্রি করবে। তোর সঙ্গেও তার ছেলের বিয়ে দিয়ে দিবে।

আমার সঙ্গে কি তিনি তার ছেলের বিয়ে দিতে চাচ্ছেন?

অবশ্যই চাচ্ছে।

মা আবারও হাসি শুরু করলেন। তিনি কেন হাসছেন কে জানে?

৪. বিব্রতকর পরিস্থিতি

আমি যে পরিস্থিতিতে পড়েছি–সংবাদপত্রের ভাষায় তাকে বলা হয় বিব্রতকর পরিস্থিতি। যতটুক বিব্রত বোধ করা উচিত তারচেয়ে বেশি বোধ করছি। চেষ্টা করছি আমাকে দেখে যেন আমার মানসিক অবস্থাটা বোঝা না যায়। এই অভিনয়টা আমি ভালো পারি। তবে সবদিন পারি না। আজ পারছি কিনা বুঝতে পারছি না।

ঘটনাটা এ রকম – ক্লাস শেষ হয়েছে। আমি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি। পেছন থেকে কাওসার স্যার ডাকলেন হ্যালো মিস।

আমি পেছন ফিরলাম। স্যার বললেন, তুমি কোন দিকে যাচ্ছ?

আমি বললাম, দিক বলতে পারব না। বাসা যে দিকে সে দিকে যাচ্ছি।

পথে আমাকে নামিয়ে দিতে পারবে? আমার মোটর সাইকেলের চাকা পাংচার হয়েছে। একটা এক্সট্রা চাকা আছে। চাকা কীভাবে বদলাতে হয় আমি জানি না।

আমি বললাম, আসুন। আপনি কোথায় যাবেন বলুন আপনাকে নামিয়ে দিচ্ছি।

আমি কোথাও যাব না। তোমার সঙ্গে গাড়িতে উঠব। হঠাৎ কোথাও নেমে যেতে ইচ্ছা করলে নেমে যাব। আর যদি নেমে যেতে ইচ্ছা না করে তোমার সঙ্গে তোমাদের বাসায় যাব। এক কাপ চা খেয়ে আসব।

স্যারের সঙ্গে কথাবার্তার এই পর্যায়ে হঠাৎ আমার অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। নিঃশ্বাস দ্রুত পড়তে থাকল। যদিও তার কোনোই কারণ নেই। কোনো অপরিচিত ভদ্রলোক আমার কাছে লিফট চাইছে না। যিনি লিফট চাইছেন তিনি আমার খুবই পরিচিত। তিনি হয়তো আজ আবার নতুন ধরনের কোনো খেলা খেলার চিন্তা করছেন। আবারো হয়তো সাইকোলজির কোনো পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার এক পর্যায়ে আমি রেগে যাব এবং আমার নিজেকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হবে।

তোমার সঙ্গে যে তোমার বাসা পর্যন্ত যাবই তা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। পথে নেমে যেতে ইচ্ছা করলে নেমে যাব।

আমি কথা বাড়ালাম না। চুপ করে রইলাম। উনার যদি নেমে যেতে ইচ্ছা করে উনি নেমে যাবেন। এই কথা বারবার শোনানোর কিছু নেই। তবে একটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে তার বাসায় যাবার জন্যে গাড়িতে ওঠা এবং মাঝপথে হঠাৎ নেমে যাওয়া তরুণী মেয়েটির জন্যে অপমানসূচক। মেয়েটি অপমানিত বোধ করবেই। আমি করব না। কারণ যে-কোনো ঘটনা আমি যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। যে সবকিছু যুক্তি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে সে সহজে অপমানিত বোধ। করে না, রাগ করে না। যুক্তিবিদ্যা মানুষকে যন্ত্রের কাছাকাছি নিতে সাহায্য করে। মানুষ বদলাচ্ছে। নতুন শতকের মানুষ যন্ত্রের কাছাকাছি যাবে এটাই স্বাভাবিক।

মৃন্ময়ী।

জ্বি।

আমি যখন বললাম, তুমি কোন দিকে যাচ্ছ–তখন তুমি উত্তর দিলে–দিক জানি না। উত্তরটা কি ঠিক হয়েছে?

হ্যাঁ ঠিক হয়েছে কারণ আমি দিক জানি না।

স্থাপত্য বিদ্যার কোনো ছাত্রী বলবে কি জানি না এটা হতেই পারে না। সূর্য কোন দিকে উঠছে, কোন দিকে অস্ত যাচ্ছে এটা তাকে সব সময় জানতে হবে। শীতের সময় সূর্য যে জায়গা থেকে উঠে গরমের সময় ঠিক সে জায়গা থেকে উঠে না। সামান্য সরে যায়। বলতে পারবে কতটুক সরে যায়?

স্যার, আমরা তো এখন ক্লাসে বসে নেই। ক্লাসের বাইরে আছি। গাড়ির ভেতর বসেও যদি ভাইভা পরীক্ষা দেই তাহলে কীভাবে হবে?

স্যার হেসে ফেললেন। আমি বললাম আপনি সব সময় ক্লাসে বলেন, আমি তোমাদের শিক্ষক না। আমি নিজেও একজন ছাত্র। কিন্তু আপনি কখনো ভুলতে পারেন না যে আপনি একজন শিক্ষক। আমি লক্ষ করেছি ক্লাসের বাইরেও আপনি সারাক্ষণই কোনো না কোনো প্রশ্ন করছেন।

আর করব না।

এখন ঠিক করে বলুনতো আপনি কি সত্যি আমার সঙ্গে চা খেতে যাচ্ছেন, না পথে নেমে যাবেন?

বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা মনে করুন আমাদের ক্লাসেরই অন্য কোনো একটা ছেলে কিংবা মেয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে তখনন কি তাকে এসে বলতেন পথে আমাকে। নামিয়ে দিতে পারবে? আমার মোটর সাইকেলের চাকা পাংচার হয়েছে?

না।

না কেন?

গাড়িতে যাওয়া আমার জন্যে জরুরি কিছু না। কার সঙ্গে যাচ্ছি সেটা জরুরি। তোমাকে তো আমি প্রথম দিনই বলেছি তোমাকে আমার পছন্দ। তোমার মতো মেয়েরা আমান্তে হিসেবে খুব ভালো হয়।

আমান্তে কী?

আমান্তে শব্দটা স্প্যানিশ। এর অর্থ হলো সেন্টিমেন্টাল ফ্রেন্ড। তুমি না চাইলেও তোমাকে আমি দেখছি একজন আমান্তে হিসেবে।

আমান্তেকে নিয়ে কি আপনি সাইকোলজির খেলা খেলেন?

মাঝে মাঝে খেলি। তবে সাইকোলজির খেলা না। ম্যাজিকের খেলা।

তার মানে?

প্রথম দিন যা করেছি সেটা হলো খুব সহজ একটা ম্যাজিক দেখিয়েছি। আমি চারটা কাগজে চার রকম লেখা লিখেছি। একটাতে লিখেছি— মৃন্ময়ী মোটর সাইকেলে চড়তে রাজি হবে না। সেই কাগজটা রেখেছি এক জায়গায়। আরেকটাতে লিখেছি—মোটর সাইকেলে চড়তে সে খুশি মনে রাজি হবে। সেটা রেখেছি অন্য জায়গায়। তুমি যাই করতে আমি সেই কাগজটা বের করে তোমাকে দেখিয়ে বলতাম তুমি কী করবে তা আমি আগে থেকেই জানি।

এতে আপনার লাভ কী হয়েছে?

তোমাকে চমকে দিতে পেরেছি—এটাই লাভ।

আপনি কি সবাইকে চমক দিয়ে বেড়ান?

না। সবাইকে চমকাতে ইচ্ছা করে না। কাউকে কাউকে করে। আমান্তেকে করে।

আপনি যে ভঙ্গিতে আমাকে বলেছেন তার থেকে আমার মনে হয়েছে–এ ধরনের কথা আপনি অবলীলায় বলতে পারেন এবং আমার আগে আরো অনেককে আমান্তে বলেছেন। বলেন নি।

হ্যাঁ বলেছি। তুমি বলো নি? মুখে বলার কথা বলছি না। বাঙালি মেয়ে এ ধরনের কথা অবলীলায় বলতে পারে না। আমি মনে মনে বলার কথা বলছি।

না আমি মুখে বা মনে মনে কখনো বলি নি।

বলতে ইচ্ছা করে নি।

না আমার ইচ্ছাও করে নি।

তুমি এমন কঠিন গলায় কথা বলছ কেন? তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে খুবই অপ্রিয় কোনো প্রসঙ্গে তুমি কথা বলছ।

প্রসঙ্গটা আমার অপ্রিয়। কোনো একটা ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হবে। আমান্তে টাইপ পরিচয়। রাত বারটার পর নিচু গলায় তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব। ছুটি ছাটার দিন ফুচকা খেতে যাব এবং কিছুক্ষণ পর পর চমকে চমকে রাস্তার দিকে তাকার কেউ দেখে ফেলল কি-না–এটা আমার খুবই অপছন্দ। স্পেনে কী হয় আমি জানি না। ঐ দেশে কখনো যাই নি তবে আমাদের দেশে প্রেমের ব্যাপারে কিছু সেট রুলস আছে। জানতে চান?

হ্যাঁ জানতে চাই।

প্রেমে পড়লে ছেলে-মেয়ের ফুচকা খেতে হবে।

কারণটা কী?

ফুচকা বিক্রি হয় পার্কে। এবং মেয়েরা খেতে পছন্দ করে। দামে সস্তা বলে ছেলেদের জন্যে খুব সুবিধা হয়।

স্যার হাসতে হাসতে বললেন তোমার কথা শুনে মজা পাচ্ছি। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আমার ফুচকা খেতে ইচ্ছা করছে। কোনো একটা পার্কে আমাকে নিয়ে চলে তো। ফুচকা খাব। আজ আর তোমাদের বাসায় যাব না। ফুচকা খেয়ে বিদায়।

আপনি সত্যি ফুচকা খাবেন?

হ্যাঁ খাব। প্রেমে পড়ার যে সব সেট রুলস এ দেশে আছে তার প্রতিটি আমি মানতে চাই। টেলিফোন কখন করতে হয় বললে রাত বারটার পর?

স্যার ঠাট্টা করবেন না।

আমি ঠাট্টা করছি না। আমি সিরিয়াস। আমরা কি ফুচকার দোকানের দিকে যাচ্ছি।

হ্যাঁ যাচ্ছি।

ফুচকা খেতে খেতে তোমাকে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলব।

এখনই বলুন।

সব কথা সব জায়গায় বলা যায় না। জনসভায় যে কথা বলা যায়, শোবার। ঘরে সে কথা বলা যায় না। চলন্ত গাড়িতে যে কথা বলা যায় সে কথা বটগাছের নিচে বসে বলা যায় না। কথা হলো পেইন্টিং-এর মতো। জয়নাল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবি তুমি তোমার ডাইনিং রুমে টানাতে পারে না। আমি বোধহয় আবার টিচার হয়ে যাচ্ছি।

হ্যাঁ যাচ্ছেন।

সরি–চুপ করলাম। ফুচকা মুখে না দেয়া পর্যন্ত আর কথা বলব না।

আমরা ফুচকা খেতে এসেছি শেরে বাংলা নগরে। কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে সারি সারি ফুচকার দোকান। স্যার মুগ্ধ গলায় বললেন–বাহ! মৃন্ময়ী তাকিয়ে দেখ এক সারি কৃষ্ণচূড়া গাছ জায়গাটাকে কেমন বদলে দিয়েছে। কৃষ্ণচূড়া গাছের বদলে যদি জারুল গাছ হতো তাহলে কী হতো! গাছ ভর্তি নীল ফুল ব্যাকগ্রাউন্ডে নীল আকাশ। লেকের পানিতেও নীল আকাশের ছায়া... একটা ড্রীম ড্রীম ব্যাপার হতো কি-না বল।

হয়তো হতো।

সোনালু বলে একটা গাছ আছে যার ফুল ছোট ছোট ফুলের রং গাঢ় সোনালি। কৃষ্ণচূড়া গাছের বদলে সোনালু গাছ হলে কেমন হয়।

জানি না কেমন হতো।

চিন্তা করে। চিন্তা করে বলে। একটা জিনিস মাথায় রেখে চিন্তা করবে। সোনালি রং বলে কিন্তু কিছু নেই। পৃথিবী সাতটা রং নিয়ে খেলা করে। রামধনুর সতি রং। কারণ আমাদের চোখ এই সাতটা রঙই দেখতে পায়। পৃথিবীতে কিন্তু আরো অনেক রং আছে। আমরা সেইসব রং দেখতে পাই না। কারণ আমাদের চোখ সেইসব রং দেখার জন্যে তৈরি না। সাতটা রং দেখার জন্যে আমাদের চোখ তৈরি হয়েছে বলেই আমরা সাতটা রং দেখছি।

নিন ফুচকা খান। খেতে খেতে ইন্টারেস্টিং কী কথা বলবেন বলুন। না-কি রং বিষয়ক এইগুলিই সেই ইন্টারেস্টিং কথা?

রঙের কথাগুলি তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না?

না তেমন ইন্টারেস্টিং লাগছে না। বুকিস কথা বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনি বই পড়ে থিওরি মুখস্থ করে এসে থিওরি কপচাচ্ছেন।

সরি।

সরি হবার কিছু নেই। আপনি কন্ডিশন্ড হয়ে গেছেন। থিওরি কপচাতে কপচাতে থিওরি কপচানো আপনার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। আপনি নিজে সেটা বুঝতে পারছেন না। আপনি কি ইন্টারেস্টিং কথাটা এখন বলবেন?

হ্যাঁ বলব। আমি লক্ষ করেছি— মোটর সাইকেলে করে একটা ছেলে প্রায়ই ইউনিভার্সিটিতে আসে। তোমাকে লক্ষ করে। তারপর চলে যায়। মাঝে মাঝে তোমার গাড়ির পেছনে পেছনে যায়। একদিন সে আমাকেও ফলো করেছে। ছেলেটা কে?

জানি না তো কে!

একটা ছেলে দিনের পর দিন তোমাকে ফলো করছে তারপরেও ব্যাপারটা তোমার চোখে পড়ল না?

না চোখে পড়ে নি।

ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করতে চাও?

অবশ্যই চাই।

সে মোটর সাইকেল নিয়ে এখানেও আমাদের পেছনে পেছনে এসেছে। এই মুহূর্তে সে আছে তোমার প্রায় বিশ গজ পেছনের কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে। তার গায়ে বিসকিট কালারের শার্ট। ছেলেটা সানগ্লাস পরে আছে। তার চুল কোঁকড়ানো।

আশ্চর্য কথা তো!

এই আশ্চর্য কথাটা বলার জন্যেই আজ আমি ইচ্ছা করে তোমার গাড়িতে এসেছি। ফুচকা খাওয়া বা তোমাদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া আমার মূল উদ্দেশ্য না। এই কথাগুলি বলেছি তোমাকে চমকে দেবার জন্যে।

বুঝতে পারছি। কিছু কিছু মানুষকে আপনি চমকে দিতে পছন্দ করেন।

তুমি কি ছেলেটার সঙ্গে কথা বলবে?

না আমি বলব?

না আমিই বলব।

ফুচকা জিনিসটা তো আমার খেতে খুবই ভালো লাগছে। আমি বরং এক কাজ করি আরো হাফ প্লেট ফুচকা খাই— এই ফাঁকে তুমি কথা বলে এসো। আমি অপেক্ষা করছি।

রাতের অস্পষ্ট আলোয় দেখা মানুষকে দিনের ঝলমলে রোদে দেখলে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগে। রাতে যাকে রহস্যময় মনে হয় দিনে সে-ই সাদামাটা একজন হয়ে যায়। ভাইয়ার যে বন্ধু চোখে সানগ্লাস পরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাকে বোকা বোকা দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে আমাকে দেখে ভয়ও পাচ্ছে। তার ভয় পাওয়া উচিত না। ভয় পাওয়া উচিত আমার। এই ছেলেটা ভয়ঙ্কর মানুষদের একজন। সে এখন নিজেই ভয় পাচ্ছে অথচ এই মানুষটাই যখন ছাদে ভাত খাচ্ছিল তখন মোটেও ভয় পাচ্ছিল না। তাকে বোকা বোকাও লাগছিল না। চেহারাও রাতে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছিল। ভীত মানুষের চেহারা হয়তো খারাপ হয়ে যায়। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি এখানে কী করছেন?

কিছু করছি না।

আপনি কী প্রায়ই আমাকে ফলো করেন?

সানগ্লাস পরা মানুষটা এই প্রশ্নে মনে হয় খুবই ব্রিত হয়েছে। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে এখন কৃষ্ণচূড়া গাছের সৌন্দর্য দেখায় ব্যস্ত।

কেন এই কাজটা করছেন? আমাকে কিছু বলতে চান?

না।

কিছু বলতে চাইলে বলতে পারেন।

কিছু বলতে চাই না।

আমাকে ফলো করবেন না। প্লিজ।

লাল শার্ট পরা ঐ লোকটা কে?

লাল শার্ট পরা ঐ লোক কে তা দিয়ে আপনার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন আছে?

না।

তাহলে চলে যান।

আচ্ছা।

আচ্ছা বলে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। মোটর সাইকেলে উঠে স্টার্ট দিন। প্লিজ।

মোটর সাইকেল চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। স্যার আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না। হঠাৎ খানিকটা বিষ বোধ করছি। কেন করছি তাও বুঝতে পারছি না। রাস্তার পাশেই আমার গাড়ি। ড্রাইভার গাড়ির কাচ নামিয়ে

কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছে। একটা কাজ করলে কেমন হয়? স্যারকে কিছু না বলে রাস্তা পার হয়ে গাড়িতে উঠে বসলে হয় না? তিনি খুবই অবাক হবেন। অপমানিত বোধ করারও কথা। তাতে সমস্যা কিছু নেই।

আমি ক্লান্ত ভঙ্গিতে রাস্তা পার হলাম। স্যার কী করছেন বুঝতে পারছি না। তিনি নিশ্চয়ই ফুচকার প্লেট ফেলে দিয়ে দৌড়ে আমার দিকে আসছেন না। ঘটনাটা হজম করছেন। স্যারের মতো মানুষকে অনেক কিছু হজম করতে হয়।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বললাম। স্যার কী করছেন দেখতে ইচ্ছা করছে। সেটা সম্ভব না। ভদ্রলোক এখন কী করবেন? প্রথমেই ছোট্ট একটা বিপদে পড়বেন। ফুচকার দাম দিতে পারবেন না। ফুচকার প্লেট হাতে নিয়েই তিনি বলেছেন মৃন্ময়ী, একটা ভুল করে ফেলেছি। মানিব্যাগ আনি নি। তোমার সঙ্গে টাকা আছে তো?

ফুচকার দাম দেয়ার মতো টাকা সঙ্গে নেই এটা কোনো বুদ্ধিমান মানুষের জন্যে বড় সমস্যা না। এই সমস্যার সমাধান বার করা যাবে। তিনি সুন্দর করেই এই সমস্যার সমাধান করবেন। তারপর কী হবে? তিনি চিন্তিত হয়ে বাসায় ফিরবেন। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইবেন কিন্তু করতে পারবেন না। আমার টেলিফোন নাম্বার তার কাছে নেই।

ড্রাইভার বলল, বাসায় যাব আপা।

আমি বললাম, না।

কোন দিকে যাব?

আপনার ইচ্ছামতো যে-কোনো জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে থাকুন। আধ ঘণ্টা এই রকম ঘুরবেন, তারপর বাসায় যাবেন।

ড্রাইভারের মুখ শুকিয়ে গেল। আমাদের ড্রাইভার তিনজন। তিন ড্রাইভারের একই অবস্থা হয়। যখনই বলি আপনার ইচ্ছা মতো কিছুক্ষণ গাড়ি নিয়ে চক্কর দিন। তখন তাদের দেখে মনে হয় তারা অথই সাগরে পড়ে গেছে। পরের ইচ্ছায় কাজ করতে এদের সমস্যা নেই। নিজের ইচ্ছায় তারা কিছু করতে পারে না।

নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করার ক্ষমতা এদের নষ্ট হয়ে গেছে।

দোতলার টানা বারান্দায় বাবা বসে আছেন। বাবার পাশে আজহার চাচা। বারান্দায় চেয়ারগুলি এমনভাবে পাতা যে মুখোমুখি বসার উপায় নেই। দুজন পাশাপাশি বসে আছেন। কথা বলার সময় আজহার চাচা বাবার দিকে তাকাচ্ছেন–হাত-পা নাড়ছেন। বাবা মূর্তির মতো সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। ঠোট নাড়া দেখে আলাপের বিষয়বস্তু বোঝা যাচ্ছে না, তবে আজহার চাচার মুখ ভর্তি হাসি দেখে মনে হয় দারুণ মজার কোনো কথা হচ্ছে। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। যে-কোনো মুহূর্তে তিনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াবেন। সামনের বেতের গোল টেবিলটা লাথি দিয়ে ফেলে দেবেন। এতে যদি বিরক্তি কাটা যায় তাহলে কাটা যাবে। যদি কাটা না যায় তিনি হয়তোবা দোতলার বারান্দা থেকে লাফ দেবেন।

আমি সরাসরি তাদের কাছে গেলাম। আজহার চাচা আমাকে দেখে আনন্দিত গলায় বললেন, অনেক আগেই চলে যেতাম তুই আসবি, তোর সঙ্গে দেখা হবে এই জন্যেই বসে আছি। তার বাবা বলল তোর না-কি ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার টাইমের কোনো ঠিক নেই। কখনো দুপুর তিনটায় ফিরিস, কখনো রাত আটটা?

আমি হাসলাম। হঠাৎ আপনার দেখা পেয়ে খুবই আনন্দ পাচ্ছি জাতীয় হাসি। আমার আসলেই ভালো লাগছে।

চাচা আপনি না-কি কবরের জন্যে জায়গা কিনছেন?

হ্যাঁরে মা, কিনে ফেললাম। ধানমণ্ডিতে যখন এক বিঘার একটা প্লট কিনি তখন খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম। কবরের জায়গাটা কেনার পরও সমান আনন্দ পেয়েছি। তোর বাবাকে কিনে দিতে চাচ্ছি সে কিনবে না।

আপনি তো চাচা ডেনজারাস মানুষ।

ডেনজারসি কেনরে মা?

প্রথমে কাফনের কাপড় কিনে দিলেন। এখন কবরের জন্যে জায়গা কিনে দিচ্ছেন। কয়েকদিন পর কবরের জায়গাটা বাঁধিয়ে ফেলবেন। তারপর মৌলবি রেখে দেবেন সে প্রতি বৃহস্পতিবারে গিয়ে ওজিফা পাঠ করবে। এদিকে কবরে কোনো ডেডবডিই নেই। বাবা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

আজহার চাচা শব্দ করে হেসে উঠলেন। তাঁর হাসি আর থামতেই চায় না। অনেক কষ্টে হাসি থামান, আবার হো হো করে ওঠেন। তিনি বাবার কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বললেন তোমার মেয়ের কথাবার্তা শুনেছ? জোকারী ধরনের কথাবার্তা। এ রকম কথা কয়েকটা শুনলে তো হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। বলে কী কবরে কোনো ডেডডি নেই, এদিকে প্রতি বৃহস্পতিবার ওজিফা পাঠ হচ্ছে। হা হা হা।

বাবা বিরক্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন। চোখের ভাষায় বলার চেষ্টা করলেন তুমি কেন বুঝতে পারছ না আমি এই লোকটার সঙ্গ পছন্দ করছি না? কেন তুমি তারপরেও মানুষটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? তার সঙ্গে রসিকতা করার কোনো দরকার নেই।

আজহার চাচা বললেন, মৃন্ময়ী মা আমার ছেলেটাকে আজ জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি। ছোটবেলায় কত এসেছে এখন আর আসতে চায় না। তার কথা তোর মনে আছে তো মা— ডাক নাম শুভ। তোদের বসার ঘরে ও একা একা বসে আছে। ও চা-টা কিছু খাবে কিনা একটু জিজ্ঞেস করিতো। যা লাজুক ছেলে মুখ ফুটে কিছু বলবে না। একে নিয়ে বিরাট বিপদে আছি। তাকে এমন কোনো মেয়ের হাতে তুলে দিতে হবে যে তার নাকে দড়ি দিয়ে কেনি আংগুলে বেধে রাখবে।

আমি বাবার দিকে তাকালাম। বাবা হতাশ দৃষ্টি দিয়ে ইশারায় বলার চেষ্টা করলেন খবরদার ঐ দিকে যাবি না। তার মনে ক্ষীণ সন্দেহ হলো–হতাশ দৃষ্টিটা আমি কি বুঝেছি! সে কারণেই হয়তো আজহার চাচার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ছেলে কি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেসে শুনেছি কঠিন ধর্ম পালন করে।

আজহার চাচা আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, মৃন্ময়ী মা তো বাইরের কেউ না। তার সঙ্গে কথা বলতে দোষ নাই।

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, একটা ছেলে একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে তার জন্যে যদি দোষ-গুণ বিচার করতে হয় তাহলে কথা না বলাই উচিত। মৃন্ময়ী তোর যাবার দরকার নেই তোকে দেখে বেচারা হয়তো অস্বস্তিতে পড়বে। কী দরকার? তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই খুব টায়ার্ড। তুই একটা হট শাওয়ার নে— নাশতা খেয়ে রেস্ট নে। তোর পরিশ্রম বেশি হচ্ছে। তোর রেস্ট দরকার।

আমি তাদের সামনে থেকে চলে এলাম। আমার কাছে মনে হচ্ছে কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে। বড় কোনো ঝামেলা। বাবা মুখ শুকনা করে বসে আছেন। তিনি খুবই টেনশানে আছেন। আজহার চাচা তার ছেলে শুভকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। এটাই কি টেনশনের কারণ? তিনি কিছুতেই চাচ্ছেন না আমি আজহার চাচার ছেলের সামনে যাই।

বাবা যেখানে বসেছেন আমার ঘর তার থেকে অনেক দূরে। বাবা আজহার চাচার সঙ্গে কী কথা বলছেন কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। তবে একটু পর পর আজহার চাচার হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আজহার চাচা আজ খুব আনন্দে আছেন।

বসার ঘর অন্ধকার। এই ঘরে বড় বড় জানালা আছে। জানালায় ভারী পর্দা টানা থাকে বলে ঘর অন্ধকার হয়ে থাকে। বসার ঘরে কেউ বসলে বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আজ বাতি জ্বালানো হয় নি। আজহার চাচার ছেলে শুভ ঘরের এক কোণায় জড়সড় হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে সামান্য ভীত। যেন ডেনটিস্টের কাছে এসেছে।

সূচিপত্র

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ডাক পড়বে। আমাকে দেখেই সে অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। যেন আমি ডেনটিস্টের এসিসটেন্ট। তাকে বলতে এসেছি আসুন আপনার ডাক পড়েছে।

আমি বললাম, আপনি আজহার চাচার ছেলে শুভ?

ছেলেটা মেঝের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।

আপনি কি কিছু খাবেন? চা-কফি কিংবা ঠাণ্ডা কিছু?

ছেলেটা না সূচক মাথা নাড়ল। আমি ঘরে ঢোকার পর থেকে সে একবারও আমার দিকে তাকায় নি। অথচ এই ছেলেই না-কি ছোটবেলায় আমাকে বিয়ে করার জন্যে ব্যস্ত ছিল।

আপনি একা একা বসে আছেন, আপনার খারাপ লাগছে না?

না।

আমি সামান্য চমকালাম। ছেলেটার গলার স্বর অস্বাভাবিক সুন্দর। বিষাদময়। প্রকৃতি কোনো মানুষকেই পুরোপুরি নিঃস্ব করে পাঠান না। কিছু না কিছু দিয়ে পাঠান। একে হয়তো অপূর্ব কণ্ঠস্বর দিয়ে পাঠিয়েছেন। কিংবা ছেলেটার কণ্ঠস্বর সুন্দর এটা আমার কল্পনাও হতে পারে।

বেচারা একা একা অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে দেখে আমার মনে হয়তো তার সম্পর্কে এক ধরনের করুণা তৈরি হয়েছে। করুণার কারণেই মনে হচ্ছে ছেলেটার গলার স্বর সুন্দর। শুধু একটি মাত্র শব্দ না শুনে বলা যায় না কারোর গলার স্বর সুন্দর না অসুন্দর। আমি নিশ্চিত হবার জন্যে বললাম, আপনি মেঝের। দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? লজ্জা লাগছে? ছেলেটা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। আমার নিজের উপরই রাগ লাগছে–আমি ঠিকমতো প্রশ্ন করতে পারছি না। এমনভাবে প্রশ্ন করছি যে সে কথা না বলেও জবাব দিতে পারছে। আমার প্রশ্নগুলি এমন হওয়া উচিত যেন উত্তর দিতে হলে কথা বলতে হয়।

আপনি কি নিজের বাড়িতেও এরকম চুপচাপ একা বসে থাকেন?

ছেলেটা আবারো হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। আবারো ভুল প্রশ্ন করেছি।

বসে বসে সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন?

হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়া। আমি তো দেখি ভালোই বিপদে পড়েছি। যে প্রশ্নই করছি সে মাথা নেড়ে নেড়ে পার পেয়ে যাচ্ছে।

আমি যে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছি আপনার কি খারাপ লাগছে?

ছেলেটা না সূচক মাথা নাড়ল। আমি হতাশ হয়ে বললাম, কিছু মনে করবেন না। আমি যে প্রশ্নই করছি আপনি মাথা নেড়ে জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। আমি আপনার গলার স্বর শুনতে চাচ্ছি। এইবার আমি যে প্রশ্ন করব তার জবাব দয়া করে কথা বলে দেবেন। লম্বা একটা

সেনটেন্স বলবেন। একটা লম্বা। সেনটেন্সে জবাব দিলে আমি আর আপনাকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করব না। প্রশ্নটা হচ্ছে আমি মার কাছে শুনেছি ছোটবেলায় আপনি না-কি আমাকে বিয়ে করার জন্যে ব্যস্ত ছিলেন। সেই ঘটনা কি আপনার মনে আছে?

ছেলেটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মনে আছে। তখন খুব বোকা ছিলাম। এখনো বোকা।

যে বোকা সে কিন্তু বুঝতে পারে না যে সে বোকা।

আমি বুঝতে পারি।

আপনাকে কি এর আগে কেউ বলেছে যে আপনার গলার স্বর অস্বাভাবিক সুন্দর?

হ্যাঁ বলেছে। একজন মওলানা সাহেব ছিলেন। আমাকে কেরাত শিখাতেন উনি বলেছেন।

আর কেউ বলে নি?

আপনি বলেছেন।

ও হ্যাঁ আমি তো একটু আগেই বললাম। আচ্ছা আমি যাই। আপনি আপনার মতো বসে থাকুন।

রাত এগারোটার দিকে কাওসার স্যার টেলিফোন করলেন। খুব সহজ গলায় বললেন, মৃন্ময়ী ভালো আছ?

আমি বললাম, জি স্যার ভালো আছি। আমার টেলিফোন নাম্বার পেলেন কোথায়?

জোগাড় করেছি। কীভাবে জোগাড় করেছি সেই ইতিহাস বলে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন দেখছি না। তুমি সত্যি ভালো তো?

জ্বি ভালো।

হঠাৎ করে চলে গেলে! আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।

রাগ করেন নি তো স্যার? আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা উচিত ছিল।

উচিত অনুচিত বিচার করে তো মানুষ সব সময় কাজ করতে পারে না। তোমার সেই মুহূর্তে চলে যেতে ইচ্ছা করেছে। তুমি চলে গিয়েছ। ভালো করেছ।

আপনার কাছে তো টাকা ছিল না। ফুচকাওয়ালাকে কী বলেছেন?

ঐটা কোনো সমস্যা হয় নি। যে ছেলেটি তোমাকে ফলো করে তার নাম কী?

নাম জানি না।

জিজ্ঞেস করো নি?

না জিজ্ঞেস করি নি।

ছেলেটা কে, কী করে?

ঠিক জানি না।

তার সঙ্গে তোমার কী কথা হয়েছে?

স্যার আমার বলতে ইচ্ছা করছে না।

বলতে ইচ্ছা না করলে বলতে হবে না। তুমি কোনো সমস্যায় পড়লে আমাকে বলতে পারো। আমি খুব ভালো কাউন্সেলর।

সব সমস্যার সমাধান আপনার কাছে আছে? সমস্যা থাকলে সমাধান থাকবেই। সমাধান আছে অথচ সমস্যা নেই তা কি হয়?

না, তা হয় না।

তোমাদের ওদিকে কি বৃষ্টি হচ্ছে না-কি? আমি বৃষ্টির শব্দ শুনছি।

বৃষ্টি হচ্ছে না। আমার একটা ঝড় বৃষ্টির সিডি আছে। ঐ সিডিটা শুনছি। আমার মন যখন খুব ভালো থাকে তখন এই সিডি শুনি। আবার মন যখন খুব খারাপ থাকে তখনও এই সিডি শুনি।

এখন তোমার মনের অবস্থা কী? খুব ভালো, না খুব খারাপ?

সেটা আপনাকে বলব না।

সহজভাবে কিছুক্ষণ কথা বলো প্লিজ।

আমি সহজভাবেই কথা বলছি।

তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছা করছে।

গল্প করুন। কোন বিষয় নিয়ে তোমার গল্প করতে ভালো লাগে? সে বিষয়টা বলে।

যে-কোনো বিষয় নিয়ে গল্প করতে পারেন? পৃথিবীর সব বিষয় আপনি জানেন?

গল্প চালিয়ে যাবার জন্যে গভীর জ্ঞান লাগে না। যারা ভাসা ভাসা জানে তারাই সুন্দর গল্প করতে পারে। জ্ঞানীরা ঝিম ধরে বসে থাকেন, তারা গল্প। করতে পারেন না। আমি জ্ঞানী না। নিজের বিষয় কিছুটা জানি। এর বাইরে প্রায় কিছুই জানি না। জানি না বলেই ভালো গল্প করতে পারি। আমার কথা শুনে মনে হচ্ছে না আমি ভালো গল্প করি।

হ্যাঁ মনে হচ্ছে।

তুমি কি আমার বিষয়ে কিছু জানতে চাও?

না তো!

জানতে চাইলে বলতে পারি। আমার বাবা মা, ভাই বোন—তারা কোথায় থাকে। তারা পড়াশোনা কোথায় করেছে। জানতে চাও না?

না।

আমার নিজের থেকেই তোমাকে কিছু বলতে ইচ্ছা করছে। আমার এমন কিছু বিষয় আছে যা শুনলে তুমি চমকে উঠবে।

মানুষকে আপনি খুব চমকাতে পছন্দ করেন তাই না?

তা করি। তবে আমার নিজের সম্পর্কে জেনে তুমি যে চমকটা খাবে সেটা রিয়েল। বাকিগুলি ফেব্রিকেটেড চমক। কষ্ট করে তৈরি করা। চমকে দেব?

দিন।

আমি রং নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলেছিলাম মনে আছে তো? আমি যখন স্থাপত্য বিষয়ের আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট তখন রঙের ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ঢুকে। আমাদের একজন টিচার ছিলেন, নাম জন রে জুনিয়র, উনিই ঢুকিয়ে দেন। ক্লাসে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, সাতটা রঙের বাইরেও যে আরো অসংখ্য রং আছে তা বুঝতে পারার কিছু পদ্ধতি আছে। ড্রাগ নেয়া হলো তার একটি। কিছু কিছু ড্রাগ আছে যা রক্তে মিশলে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়,

যে সব রং পৃথিবীতে নেই সেইসব রং দেখা যায়। তিনি কিছু কিছু ড্রাগের নামও বললেন– তার একটি হচ্ছে LSD. তুমি LSD-এর নাম শুনেছ?

হ্যাঁ শুনেছি।

স্যারের কথা কতটুকু সত্যি তা পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি LSD নিলাম।

রং দেখতে পেলেন।

হ্যাঁ পেলাম। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আমার ভুবন রঙে রঙময় হয়ে গেল। রঙের কোনো শেড না— Pure colour. আমি বর্ণনা করতে পারব না, বা এঁকেও দেখাতে পারব না কারণ এই রঙগুলি পৃথিবীতে নেই। মৃন্ময়ী তুমি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ?

হ্যাঁ শুনছি।

অভিজ্ঞতাটা আমার জন্যে এতই অসাধারণ ছিল যে আমার নিজের ভুবন এলোমেলো হয়ে গেল। একের পর এক LSD TRIP নিতে থাকলাম। এক সময় পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হলো। দীর্ঘ দিন চিকিৎসা করে সুস্থ হতে হলো।

এখন আপনি সুস্থ?

না এখনো ঠিক সুস্থ না। হঠাৎ হঠাৎ মাথার ভেতর রঙগুলি উঠে আসে। আমার চারপাশের পৃথিবী Unreal হয়ে যায়। আমি প্রবল ঘোরের মধ্যে চলে যাই। উদাহরণ দিয়ে বলি–

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মনে করে আমি কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে আছি। লাল ফুল। পেছনে ঘন নীল আকাশ। হঠাৎ ফুলের লাল রঙটা কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল। আকাশের নীল রঙও বদলে গেল। রঙগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো। ওরা হয়ে গেল জীবন্ত। ওরা নিঃশ্বাস নিচ্ছে, নিঃশ্বাস ফেলছে, ছটফট করছে। কখনো কাঁদছে, কখনো রং হাসছে। বুঝতে পারছ কী বলছি?

মনে হয় পারছি।

এই ব্যাপারগুলি ঘটে যখন খুব পছন্দের কেউ আশেপাশে থাকে। Sentimental friend type কেউ। আমি যখন ফুচকা খাচ্ছিলাম তুমি ছেলেটার সঙ্গে গল্প করতে গেলে। আমি তাকালাম কৃষ্ণচূড়া ফুলের দিকে, তখন ব্যাপারটা ঘটল। সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল।

আপনি কি এখনো LSD নেন?

না। এখন আর নেয়ার দরকার পড়ে না।

আপনার কাছে কি LSD আছে?

হ্যাঁ আছে। কেন, তুমি কি একটা LSD ট্রিপ নিয়ে দেখতে চাও– রং ব্যাপারটা আসলে কী?

আমি বললাম, ঠিক বুঝতে পারছি না।

অভিজ্ঞতার জন্যে একবার নিয়ে দেখতে পারো। তবে না নেয়াই ভালো। রঙের আসল রূপ দেখে ফেললে সাধারণ পৃথিবীর রং আর ভালো লাগবে না। পৃথিবীটাকে খুবই সাধারণ

খুবই পাশে মনে হবে। প্রায়ই মনে হবে দূর ছাই এই পৃথিবীতে থেকে কী হবে? যারা LSD নেয় তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা এই কারণেই খুব বেশি। অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বললাম, ঘুমাও।

এই বলেই স্যার খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মা ঘরে ঢুকলেন। মার হাতে চায়ের বিরাট মগ। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে তিনি প্রায় এক বালতি গ্রিন টি খান। তার ডায়েটিশিয়ান বান্ধবী তাকে বলেছেন ঘুমুতে যাবার আগে প্রচুর গ্রিন টি খেতে। গ্রিন টিতে আছে এন্টি অক্সিডেন্ট। এবং ন্যাচারাল ভিটামিন ই।

মা হাসিমুখে খাটে বসতে বসতে বললেন, তোর কি শুভর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

মা বললেন, আমার দেখা হয়েছে। আমি কথা বলেছি। আমাকে দেখে ঝাপ। দিয়ে এসে কদমবুসি করে ফেলল। আমি বললাম, কেমন আছ? সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, ভালো। এরপর বেশ কিছু সময় ছিলাম। অনেক কথা বলেছি। সে জবাব দিয়েছে, একবারও আমার দিকে তাকায় নি।

এইসব আমাকে শুনাচ্ছি কেন?

মজার ঘটনা এই জন্যে শুনাচ্ছি। তারপর আমি বললাম, পড়াশোনা কী করেছ? সে বলল বিএ পরীক্ষা দিয়েছি, পাস করতে পারব না। আমি বললাম, এই প্রথমবার দিলে? সে বলল, জ্বি না, আগেও দুইবার দিয়েছি।

মা শরীর দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, হাসির কিছু হয় নি মা। সে সত্যি কথা বলেছে। লুকায় নি। কেউ সত্যি কথা বললে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করা যায় না।

মা চোখ বড় বড় করে বললেন, তুই রেগে যাচ্ছিস কেন? এখনো তো ছেলেটার তোর সঙ্গে বিয়ের দলিল রেজেষ্ট্রি হয় নি। আগে হোক, তারপর রাগ করিস।

আমি বললাম, এইসব কী বলছ তুমি?

মা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, তোর সঙ্গে ঠাট্টা করলাম। ঠাট্টাও করতে পারব না।

এই ঠাট্টাটা আমার ভালো লাগছে না।

ঠাট্টা তো করাই হয় ভালো না লাগার জন্যে। ঠাট্টা শুনে তুই যদি মজা পাস তাহলে তো আর এটা ঠাট্টা থাকে না। সেটা হয়ে যায় রসিকতা।

ঠিক আছে মা ঠাট্টা করো।

মা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, তুই কিন্তু LSD ট্যাবলেট আমাকেও দিবি। আমি খেয়ে দেখব রঙের ব্যাপারটা কী। আয় আমরা মা মেয়ে দুজন এক সঙ্গে খাই।

আমি মার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মা বললেন, টেলিফোনের প্যারালাল কানেকশন তো। তুই যখন কারো সঙ্গে কথা বলিস তখন মাঝে মাঝে আমি শুনি।

যেন টেলিফোনে লুকিয়ে কথা শোনা কোনো ব্যাপার না। এমন ভঙ্গিতে মা ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকে বললেন, তোকে তো আসল কথাই বলা হয় নি। নকল কথা নিয়ে ছোটাছুটি করছি। তোর আজহার চাচা তার ছেলের বিয়ের তারিখ ঠিক করতে এসেছেন। তোর বাবাকে বললেন। খুব খুশি। তার হাসি শুনতে পাচ্ছিলি না। তোর জন্যে বিশাল এক গিফট প্যাকেট এনেছেন। এখন খুলবি না পরে খুলবি?

আমি মার দিকে তাকিয়ে আছি। মা গ্রিন টির মগে চুমুক দিচ্ছেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে চা-টা খেয়ে তিনি খুব তৃপ্তি পাচ্ছেন।

৫. ভাইয়া

গাড়ি বারান্দার সিঁড়িতে, যেখানে দারোয়ান এবং মালীরা সাধারণত বসে থাকে। ভাইয়া সেখানে বসে আছে। তার মুখ বিষণ্ণ। দেখেই মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে। শরীর কি খারাপ করেছে? ভাইয়া এমন মানুষ যে শরীর ভয়ঙ্কর খারাপ করলেও কাউকে কিছু জানাবে না। হয়তো তার কাছে শারীরিক কষ্ট অরুচিকর ব্যাপার। যা অন্যদের কাছ থেকে গোপন রাখতে হয়।

ভাইয়া এ বাড়িতে থাকতে আসার দিন পনের পরের কথা— বাবা এক সকালবেলা গাড়ি বের করে আমাকে বললেন টগরকে ডেকে নিয়ে আয়তে। ওকে কিছু জামাকাপড় কিনে দেব। ওতো ফকির মিসকিনের কাপড় চোপড় নিয়ে এসেছে। মৃন্ময়ী, তুইও চল আমাদের সঙ্গে। আমি ভাইয়াকে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ড্রাইভার ঘটাং করে গাড়ির দরজা বন্ধ করল। ভাইয়া গাড়ির দরজায়। হাত রেখেছিল, তার হাতের তিনটা আঙ্গুল থেতলে গেল। সে অস্পষ্ট গলায় শুধু বলল, উফ।

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, কী হয়েছে?

ভাইয়া বলল, কিছু হয় নাই।

বাবা বললেন, দরজায় হাত রেখে বসেছিলে কেন? গাড়িতে চড়ারও কিছু নিয়ম কানুন আছে। লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেই হয় না। ব্যথা পেয়েছ।

ভাইয়া চাপা গলায় বলল, না।

বাবা বললেন, ড্রাইভার চালাও, বনানী মার্কেটের দিকে যাও।

আমি বললাম, না। আগে কোনো ডাক্তারের কাছে চলো। ভাইয়া খুবই ব্যথা পেয়েছে, রক্ত পড়ছে। রক্তে তার সার্ট মাখামাখি হয়ে গেছে।

আমরা একটা ক্লিনিকে গেলাম। ক্লিনিকের ডাক্তার সাহেব বললেন, কী সর্বনাশ! এই ছেলের তো একটা আঙ্গুল ভেঙে গেছে। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান, কিংবা পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যান।

বাবা বিরক্ত মুখে বললেন, একটা আঙ্গুল ভেঙে গেছে তারপরেও কোনো শব্দ করে নাই। এ তো ডেনজারাস ছেলে। একে তো সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখা দরকার।

টগর নামের অতি শান্ত অতি নম্র কিশোরটি একটি ডেনজারাস ছেলে এই চিন্তাটা বাবা মাথা থেকে কখনো দূর করতে পারেন নি। দূর কোনোদিন হবে বলেও আমার মনে হয় না। মানুষের প্রথম ধারণা সব সময় দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভাইয়াকে এ রকম অসহায় ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে আমার খুবই মায়া লাগল। এইখানে একটা ভুল কথা বললাম— ভাইয়াকে দেখলেই আমার মায়া লাগে। তাকে অসহায় ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখলেও মায়া লাগে, আবার সহায় ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখলেও মায়া লাগে। আমি বললাম, শরীর খারাপ না-কি?

না। মৃ তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

এইখানে বলবে না ঘরে যেতে হবে?

ঘরে আয়।

কথা যা বলার এক মিনিটের মধ্যে বলে শেষ করতে হবে। আমার আজও ক্লাসে দেরি হয়ে গেছে।

তাহলে এখানেই বলি।

বলো।

ভাইয়া ইতস্তত করতে লাগল। আমি খুবই অবাক। এমন কী কথা যা আমাকে বলতে ভাইয়ার ইতস্তত করতে হচ্ছে। আমি ধমকের মতো বললাম, বলো তো কী বলবে।

আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবি?

আমি হ্যান্ডব্যাগ খুলতে খুলতে বললাম, অবশ্যই পারব। বলো কত লাগবে পাঁচ শ টাকায় হবে?

পাঁচ শ টাকায় হবে না। অনেক বেশি টাকা লাগবে। কারো কাছ থেকে জোগাড় করে দিতে পারবি?

অবশ্যই পারব। বাবার কাছ থেকে এনে দেব।

টাকাটা যে আমার দরকার এটা জানলে বাবা দেবেন না।

বাবাকে বলব না। এখন দয়া করে বলে কত টাকা?

ষাট হাজার টাকা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ষাট হাজার টাকা! এত টাকা?

ভাইয়া নিচু গলায় বলল, হ্যাঁ। বিকাল চারটার আগে টাকাটা লাগবে। মৃ পারবি?

না পারার তো কোনো কারণ দেখি না।

বিকাল চারটার আগে টাকাটা দরকার।

আমার মনে আছে। আমি কি জানতে পারি বিকাল চারটার আগে এতগুলি টাকা কেন দরকার।

ভাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল— পরে বলি? এখন বলতে ইচ্ছা করছে না।

বলতে ইচ্ছা না করলে তোমাকে কখনো বলতে হবে না।

থ্যাংকু য়।

আমি গাড়িতে উঠেই মোবাইল ফোনে বাবাকে টেলিফোন করলাম। ষাট হাজার টাকা বাবার জন্যে কোনো ঘটনাই না। বাবা টেলিফোন ধরলেন। কিছুটা অবাক হয়েই বললেন, মা ব্যাপার কী?

কোনো ব্যাপার না বাবা, আমার কিছু টাকা দরকার।

কখন দরকার?

আমি ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরব একটার সময়। তখনই দরকার। তুমি কাউকে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিও।

তেমন প্রয়োজন মনে করলে আমি রহমতকে দিয়ে তোর ইউনিভার্সিটিতেও পাঠাতে পারি।

ইউনিভার্সিটিতে পাঠাতে হবে না। বাড়িতে পাঠাও।

এমাউন্ট বল। এমাউন্টটা বেশি। আমার দরকার ষাট হাজার টাকা। Sixty thousand.

হঠাৎ এত টাকা। কী জন্যে দরকার বল তো?

সেটা এখন বলতে পারব না। ষাট হাজার টাকা তোমার জন্যে দেয়া কি কোনো সমস্যা?

না, সমস্যা না।

বাবা টাকাটা অবশ্যই দেড়টার মধ্যেই পাঠাবে। আমার দরকার চারটার আগে। তারপরেও কিছু সময় হাতে থাকা ভালো।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মৃ টাকাটা তোর দরকার না। অন্য কারোর দরকার। আমার ধারণা তোর কাছে টাকাটা চেয়েছে টগর। ধারণা কি ঠিক?

আমি বললাম, টাকাটা আমি তোমার কাছে চাচ্ছি। এটাই মূল বিষয়।

বাবা শান্ত গলায় বললেন, এটা অবশ্যই মূল বিষয় না। তুই আমাকে খোলাখুলি বল – টাকাটা কি টগরের দরকার?

হ্যাঁ।

কী জন্যে দরকার?

বাবা আমি জানি না। আমাকে ভাইয়া বলে নি।

ঠিক আছে আমি টেলিফোন করে টগরের কাছ থেকে জেনে নিচ্ছি।

তুমি অবশ্যই ভাইয়াকে টেলিফোন করবে না। ব্যাপারটা সে তোমাকে জানাতে চাচ্ছে না।

কেন জানাতে চাচ্ছে না? সে তোমাকে ভয় পায়।

পুরো ব্যাপারটায় ফিসি কিছু আছে। ফিসি কোনো ব্যাপারই আমার পছন্দ না। মৃন্ময়ী মা শোন, এই টাকাটা আমি দেব না।

আমি খুবই বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি দেবে না!

বাবা শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, না। টগরকে আমার কাছে আসতে হবে। ওকে এক্সপ্লেইন করতে হবে।

না দিলে দিও না, কিন্তু ভাইয়াকে এ বিষয়ে দয়া করে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

আচ্ছা। জিজ্ঞেস করব না।

বাবা টেলিফোন রেখে দিলেন।

আমি একটা ধাক্কার মতো খেলাম। বাবা অতি বুদ্ধিমান একজন মানুষ। বুদ্ধিমান মানুষ কখনো তার প্রিয়জনদের সঙ্গে এমন রূঢ় আচরণ করে না। আমি একটা ছোট্ট ভুল করেছি। আমার বলা উচিত ছিল— টাকাটা আমার নিজের ব্যক্তিগত কোনো কারণে দরকার। কারণটা এখন ব্যাখ্যা করতে পারছি না। পরে ব্যাখ্যা করব। মিথ্যা বলা হতো। আমি নিজে মিথ্যা বলার জন্যে নিজের কাছে ছোট হয়ে থাকতাম। কিন্তু বেচারা ভাইয়া উদ্ধার পেত। সে নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোনো সমস্যায় পড়েছে।

মোবাইল ফোন বাজছে। বাবা টেলিফোন করেছেন। ফোন সেটে তাঁর নাম্বার ভাসছে। প্রচণ্ড রাগ লাগছে। টেলিফোন ধরতে ইচ্ছা করছে না। এই অভদ্রতাটা করা কি ঠিক হবে?

হয়তো বাবা টেলিফোন করেছেন সরি বলার জন্যে। হয়তো তিনি মত বদলেছেন। রহমত চাচাকে টাকা দিয়ে পাঠাচ্ছেন। মানুষের ভেতর সব সময় জোয়ার ভাটার খেলা চলে। এই রাগ এই ভালোবাসা। এই মেঘ এই রৌদ্র।

মৃন্ময়ী।

হ্যাঁ বাবা।

তুই কি এখনো পথে।

হ্যাঁ জামে আটকে পড়েছি।

ক্লাসের দেরি হয়ে গেল না?

রোজই হচ্ছে। তুমি কী বলার জন্যে টেলিফোন করেছ সেটা বলে ফেল।

মৃন্ময়ী শোন, তুই মনে হয় আমার ওপর রাগ করেছি। পুরো ব্যাপারটা তোকে ঠাণ্ডা মাথায় দেখতে হবে।

বাবা আমার মাথা এখন মোটেই ঠাণ্ডা না, কাজেই ঠাণ্ডা মাথায় আমি কিছুই চিন্তা করতে পারছি না। পরে তোমার সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করি।

আলোচনার কিছু নেই। আমার যা বলার আমি এখনি বলে শেষ করব। আমার ধারণা আমার কথা শোনার পর কথার পেছনের লজিক তুই ধরতে পারবি। জগতটা আবেগের

না মা। জগতটা লজিকের। পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে কোনো আবেগে ঘুরছে না। লজিকে ঘুরছে।

এই লজিক সৃষ্টির পেছনে কিন্তু কাজ করেছে আবেগ।

সেটা তো আমরা জানি না। লজিকটা আমরা জানি। যা জানি কথা হবে তার ভিত্তিতে।

বেশ বলো তোমার লজিক।

বাবা শান্ত গলায় বললেন, টগর হলো এমন এক ছেলে যার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। ডিগ্রি পরীক্ষা দুবার দিয়েছে। এই তার যোগ্যতা। প্রতি মাসে আমার কাছ থেকে যে টাকাটা হাত খরচ হিসেবে পায় এটাই তার বর্তমানের রোজগার এবং হয়তোবা ভবিষ্যতের রোজগার। এই পর্যন্ত যা বলেছি ঠিক আছে?

হ্যাঁ ঠিক আছে।

তার কিছু বন্ধু বান্ধব আছে যারা ছায়া জগতের বাসিন্দা। দু একজনের পেছনে পুলিশ ঘুরছে। যা বলছি ঠিক আছে মা?

হ্যাঁ ঠিক আছে।

এখন টগর নামের অপদার্থ ছেলেটার হঠাৎ ষাট হাজার টাকার দরকার পড়ে গেল। বাবা হিসেবে আমি প্রথম যে চিন্তাটা করব তা হলো সে বড় কোনো ঝামেলায় জড়িয়েছে। টাকা

দিয়ে ঝামেলা মেটানো যায় না। টাকায় ঝামেলা বাড়ে। টাকাটা না দিয়ে আমার উচিত খোঁজখবর করা ঘটনা কী?

তোমার টাকা দিতে হবে না। তোমার প্রতি আমার একটাই অনুরোধ তুমি এই নিয়ে কোনো খোঁজখবর করবে না। ভাইয়াকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

তোর অনুরোধ রাখব। এবং আশা করব তুইও আমার কথা রাখবি।

তোমার কী কথা?

টগরের টাকাটা অন্য কোনো সোর্স থেকে জোগাড় করার চেষ্টা করবি না।

আমার আর কোনো সোর্স নেই।

তুই বুদ্ধিমতী মেয়ে। সোর্স বের করা তোর জন্যে কোনো সমস্যা না।

থ্যাংক য়ু ফর দি কমপ্লিমেন্ট। বাবা টেলিফোন রাখি?

টেলিফোন রাখার আগে তুই কি স্বীকার করবি আমি যে কথাগুলি বলছি তার পেছনে যুক্তি আছে?

হ্যাঁ স্বীকার করছি।

বাবা টেলিফোন রেখে দিলেন।

পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাস। আমি উপস্থিত হলাম চল্লিশ মিনিট পর। ক্লাসে ঢুকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। টিচার নেই। কাওসার স্যার ক্লাস নিতে আসেন নি। যে যার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। কেউ কেউ ডিজাইন টেবিলে বসে কাজ করছে। তবে বেশির ভাগই গল্প করছে। ফরিদা বলল-ইউনিভার্সিটির কারেন্ট গুজব শুনেছি? আমাদের বিখ্যাত গরু স্যার রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়েছেন।

আজ ক্লাসে আসেন নি এই কারণেই এমন গুজব?

তিনি গত তিনদিন কোনো ক্লাসে আসছেন না। তিনদিন আগে থেকেই বাজারে গুজব ভাসছে। দুই রকমের গুজব। একটা হলে তিনি চাকরি করবেন না রেজিগনেশন লেটার দিয়েছেন। দ্বিতীয়টা হলো ইউনিভার্সিটি তার চাকরি নট করে দিয়েছে। দুটা গুজব যখন বাজারে চালু থাকে তখন দুটা গুজবের একটা সত্যি হয়। কোনটা সত্যি কে জানে!

যেটাই সত্যি হোক ফলাফল তো একই।

তা ঠিক। আমরা গুজব অনুসন্ধান কমিটি করেছি। আমি সেই কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল। আমার দায়িত্ব হচ্ছে আজ বিকাল চারটার মধ্যে রিপোর্ট দেয়া। তুই আমার সঙ্গে কাজ করবি?

না।

আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি। স্যারের নাম্বারে টেলিফোন করেছি। সেই নাম্বারে কেউ ধরছে না। ইউনিভার্সিটি থেকে ঠিকানা নিয়ে তার বাসায় গিয়েছি। সেখানেও কেউ নেই। তবে বিভিন্ন জায়গায় স্পট লাগানো আছে। খোজ বের হয়ে পড়বে। তোকে দেখে মনে হচ্ছে হয় তোর প্রচণ্ড মন খারাপ নয় তোর খুব ক্ষিধে লেগেছে। কোনটা সত্যি?

দুটাই সত্যি। আমি সকালে নাশতা করি নি। এবং আমার মনও খারাপ।

ক্যান্টিনে নাশতা করে নে। ভেজিটেবল রোল আছে, গরম গরম ভাজছে। নাশতা খেয়ে আয় তোর সঙ্গে গোপন কথা আছে। খুবই গোপন। সিক্রেট টু দা হাইয়েস্ট ওয়ার্ডার।

মুখ প্যাঁচার মতো করে রাখলে–গোপন কথা বলা যাবে না। মনের দুঃখ এক পাশে সরিয়ে–আমার কাছে আয়। গোপন কথা শুনে যা।

আমি ফরিদার দিকে তাকালাম। যত দিন যাচ্ছে এই মেয়ে তত মোটা হচ্ছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে সে তার বিশাল শরীর নিয়ে মোটেই চিন্তিত না। মনের সুখে খাওয়া দাওয়া করছে। ক্লাসের শেষে বাড়ি যাবার আগে অবশ্যই সে আইসক্রিম খাবে। সে একা খাবে না। সঙ্গে যারা থাকবে তাদের সবাইকে খেতে হবে। মানুষকে নানান ক্যাটাগরিতে ফেলা যায়। ফরিদী এমন মেয়ে যাকে কোনো ক্যাটাগরিতে ফেলা যাবে না।

ফার্স্ট ইয়ারের প্রথম সেমিস্টার শুরুর দিনে ফরিদা সবাইকে একটা কাগজ পাঠাল। কাগজের ওপর লেখা জন্মদিন–জানিয়ে দিন।

তার নিচে গুটি গুটি করে লেখা–

সহযাত্রী বন্ধুদের অনুরোধ করা যাচ্ছে–তাঁরা যেন তাদের জন্মদিন এই কাগজে লিখে দেন। যাতে ক্লাসের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমরা জন্মদিন পালন করতে পারি।

ফরিদা তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। জন্মদিন পার্টি হচ্ছে। ফরিদা একাই একশ। কথায় কথায় 'খুবই গোপন। সিক্রেট টু দি হাইয়েস্ট ওয়ার্ডার' বলা তার মুদ্রাদোষ।

ভেজিটেবল রোল খেতে খেতে মাকে টেলিফোন করলাম। মা তাঁর স্বভাব মতো উল্লসিত গলা বের করলেন, মৃ তুই বিশ্বাস করবি না এক মিনিট আগে। মনে হলো তোর টেলিফোন আসছে। আমার মোবাইলের ব্যাটারি শেষ হয়ে আসছে। মোবাইল অফ ছিল। এক মিনিট আগে অন করেছি। কারণ আমি নিশ্চিত তুই টেলিফোন কবি। টেলিপ্যাথির কথা অনেক শুনেছি এই প্রথম নিজের চোখে দেখলাম। কী যে অবাক হয়েছি। এখনো গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে আছে। তোর সঙ্গে গাড়ি আছে না? তুই এক কাজ কর গাড়ি নিয়ে হুট করে চলে আয়–আমার গায়ের নোম যে খাড়া হয়ে আছেনিজের চোখে দেখে যা। আসতে পারবি?

না আসতে পারব না। তোমার মোবাইলের ব্যাটারি শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি কাজের কথা সেরে নেই।

বল তোর কাজের কথা দাঁড়া এক সেকেন্ড তোর কাজের কথার আগে আমি আমার নিজের কথা বলে নেই, পরে ভুলে যাব। আমার বেলায় এটা খুব বেশি হয়। সময় মতো কথা বলা হয় না বলে কখনোই বলা হয় না। কথাটা হলো– আমি মোজা বানাতে পারে এমন

একজনের সন্ধান পেয়েছি, তিনি আমাকে মোজা বানানো শিখিয়ে দেবেন। তিনি পায়ের মোজা বানাতে পারেন আবার হাত মোজাও বানাতে পারেন।

ভালো তো।

কোন মোজাটা বানাব সেটা বুঝতে পারছি না। স্ক্রীপ্টে কিছু লেখা নেই। তোর কী মনে হয়?

ডিরেক্টর সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।

প্রতি দশ মিনিট পরপর তাঁকে টেলিফোন করছি। রিং হচ্ছে কিন্তু কেউ ধরছে না।

মা তোমার কথা কি শেষ হয়েছে? আমি কি আমার কথাটা বলতে পারি?

তোর ষাট হাজার টাকা দরকার এই তো কথা?

জাননা কীভাবে?

তোর বাবা টেলিফোন করে আমাকে জানিয়েছে যেন আমি টাকাটা না দেই।

ও আচ্ছা।

মৃ শোন উলের মোজা সাধারণত কোন কালারের হয় বল তো?

মা আমি জানি না কোন কালারের হয়। আমি নিজে কখনো উলের মোজা পরি না।

তুইও পরেছিস। জানুয়ারির সাত তারিখ তোর জন্ম। প্রচণ্ড শীত। তোর হাতে পায়ে উলের মোজা পরিয়ে রাখতাম। ছবিও তোলা আছে।

মা এখন রাখি।

রাখতে হবে না। আমার মোবাইলের ব্যাটারি একদম শেষ পর্যায়ে। এক্ষুণি বন্ধ হয়ে যাবে। পিক পিক শব্দ হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি না?

পাচ্ছি।

আয় আমরা কথা বলতে থাকি। ব্যাটারিও শেষ। আমাদের কথাও শেষ।

বেশ কথা বলে।

তুই এমন রাগী রাগী গলা করে রাখলে কথা বলব কী? খেয়াল রাখবি একে তো আমি মা, তার ওপর বয়সে বড়। হি হি হি।

শুধু শুধু হাসছ কেন?

এত সুন্দর একটা ডায়ালগ বলেছি এই আনন্দে হাসছি। একে তো আমি মা, তার ওপর বয়সে বড়। আমার নিজের কথা না। এত গুছিয়ে কথা বলব এমন বুদ্ধি আমার নেই।

পরশুরামের ডায়ালগ। আমি কী করি জানিস নানান জায়গা থেকে ইন্টারেস্টিং ডায়ালগ মুখস্ত করে রাখি সময় বুঝে ব্যবহার করি।

ভালো। মৃ, এক্ষুণি ব্যাটারি চলে যাবে। টা টা বাই বাই বলে দে।

মা শোনো, আহ্লাদী করতে একটুও ইচ্ছা হচ্ছে না। আমার প্রচণ্ড মন খারাপ, শরীরও খারাপ সব মিলিয়ে কেমন এলোমেলো লাগছে।

মন ভালো করে দেই?

কোনো প্রয়োজন নেই মা। তোমার কথা শুনে মাথাও ধরে গেছে। মানসিক যন্ত্রণাটা শারীরিক যন্ত্রণায় টার্ন নিচ্ছে।

আমি তোর মাথা ধরা সারিয়ে দেব, মন খারাপ ভাব সারিয়ে দেব, শরীরও দেখবি ভাল হয়ে গেছে। কি দেব? আচ্ছা ঠিক আছে দিচ্ছি। শোন মৃ, টগরকে টাকাটা আমি দিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণ অকারণেই তোর সঙ্গে খটখট করলাম।

টাকা দিয়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ। ব্যাংক থেকে তুলে এনে দিয়েছি। তোর বাবা জানতে পারলে কেঁচা দেবে।

থ্যাংক য়ু মা বলে একটা চিৎকার দিতে ইচ্ছা করছে। চিৎকার দিতে পারলাম না কারণ মার মোবাইলের ব্যাটারি শেষ হয়ে যোবাইল অফ হয়ে গেছে।

আমার মাথা ধরা নেই, মন খারাপ ভাব পুরোপুরি দূর হয়েছে। শরীর ঝরঝরে লাগছে। মা যেমন ছেলেমানুষি করে আমারও সে রকম কিছু করতে ইচ্ছা করছে। বৃষ্টিতে ভেজা টাইপ কিছু। এখন নভেম্বর মাস। আকাশে শীতের ঝলমলে রোদ। বৃষ্টির কোনোই সম্ভাবনা নেই। এমন কোনো দিন সত্যি কি আসবে যখন প্রকৃতি পুরোপুরি মানুষের মুঠোর মধ্যে চলে আসবে? আমার বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে। আমি ছাদে উঠে দুহাত আকাশের দিকে তুলে বললাম, বৃষ্টি! ওমি ছাদে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি শুধুই আমাকে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। আর কাউকে কিছু করল না।

বাড়ি ফিরলাম সন্ধ্যা পার করে। সন্ধ্যার অনেক আগেই ফিরতে পারতাম। শেষ ক্লাসটা হয় নি। তিনটার পর থেকেই ছুটি। মাঝে মাঝে ঘরে ফিরতে ইচ্ছা। করে না। ইচ্ছা করে শুধুই ঘুরে বেড়াই। প্রাণীজগতের ভেতর একমাত্র মানুষই হয়তো এমন প্রাণী যার হঠাৎ হঠাৎ ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করে না। কিংবা কে জানে প্রাণী জগতের অনেকেরই হয়তো ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করে না। পাখিদের সম্বন্ধে পুরোপুরি না জেনেই হয়তো জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন।

সব পাখি ঘরে ফেরে...

পাখিদের কেউ কেউ হয়তো কখনোই ফিরে না। ঢাকা শহর এমন একটা শহর যে ঘরে না ফিরে কোথাও যাবার জায়গা নেই। একজন মেয়ের পক্ষে একাকী কোথাও যাওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার। একটি সাধারণ কফি শপে কফি খেতে যাওয়া যাবে না। কফি শপের মালিক, কর্মচারী এবং কাস্টমাররা বারবার তীক্ষ্ণ চোখে দেখবে। তাদের চোখে প্রশ্ন এই মেয়ে একা কেন? আমার এমন অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে। মেয়েদের একা ঘোরার

জায়গা একটাই শাড়ি গয়নার দোকান। যেন তাদের জীবনটাই শাড়ি এবং গয়নার গোলকধাঁধায় আটকে গেছে। মেয়েরা অন্য কোনো গোলকধাঁধায় ঘুরতে পারবে না। এই গোলকধাঁধায় ঘুরতে পারবে।

আমার যখন একা ঘুরতে ইচ্ছা করে গাড়ি নিয়ে শালবনের দিকে চলে যাই। শালবন শব্দটা মনে হলেই আমাদের চোখে ভাসে নিবিড় বন। মাঝখান দিয়ে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। অতি নির্জন রাস্তা। বাতাসে শালবনের পাতা কেঁপে মোটামুটি ভয় ধরে যায় এমন শব্দ হচ্ছে আবার থেমে যাচ্ছে। যে শব্দের সঙ্গে সমুদ্র গর্জনের কিছু মিল আছে।

বাংলাদেশের শালবন সে রকম না। বেশির ভাগ গাছ কাটা হয়ে গেছে। বনের ফাঁক ফোকড়ে ধনী জমি। বাড়ি ঘর। হাঁস মুরগি পালা হচ্ছে। এমনকি ইন্ডাস্ট্রি পর্যন্ত হয়ে গেছে। মশা মারা কয়েলের ইন্ডাস্ট্রি, জাপানি সহযোগিতায় মাছের খাদ্য প্রস্তুতের ইন্ডাস্ট্রি। এলাম তৈরির কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি। শালবনের ভেতর দিয়ে যে হাইওয়ে গিয়েছে সেখানে হেন যানবাহন নেই যা চলছে না। মহিষের গাড়ি থেকে শুরু করে কন্টেইনার আনা-নেওয়া করে দৈত্য-ট্রাক সবই আছে। এক মুহূর্তের জন্যও রাস্তা ফাঁকা না।

তারপরেও বনের ভেতর যেতে আমার ভালো লাগে। হাইওয়ের এক পাশে গাড়ি রেখে হুট করে বনে ঢুকে পড়া। খুব ভেতরে ঢুকতে সাহস হয় না। তারপরেও অনেকখানি ভেতরে চলে যাই। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চলাচলের শব্দ শোনা না যাওয়া পর্যন্ত এগুতে থাকি। এক সময় ভয় লাগতে শুরু করে। অচেনা জায়গার ভয়। বনের ভেতর লুকিয়ে থাকা ডাকাতের ভয়। নির্জনতার ভয়। তখন সামান্য সময়ের জন্য হলেও নিজের মধ্যে এক ধরনের ঘোর তৈরি হয়। সেই সময় অদ্ভুত সব কাণ্ড করতে ইচ্ছা করে।

ড্রাইভার রহমত আমার এই স্বভাবের কথা জানে। তাকে যখনই বলি শালবনের কাছে নিয়ে চলল, সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মুখ শুকিয়ে কেমন ছাতা-মারা হয়ে যায়। আমার ধারণা রাতে সে যে সব দুঃস্বপ্ন দেখে তার বেশির ভাগই শালবন সম্পর্কিত। সে গাড়ি নিয়ে শালবনের ভেতর ঢুকছে। আমি গাড়ি থেকে নেমে বনের ভেতর চলে যাচ্ছি। হঠাৎ আর্তনাদ। কয়েকজন মুখোশ পরা ডাকাত আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বাঁচাও বাঁচাও করে চিকার করছি। ঘুমের এই পর্যায়ে রহমতের ঘুম ভেঙে যায়। সে বিড়বিড় করে তার স্ত্রীকে বলে পানি খাওয়াও। আজ আবার দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

সন্ধ্যাবেলা ভাইয়ার ঘরে বাতি জ্বলছে। এটা খুবই অদ্ভুত ঘটনা। সন্ধ্যাবেলা সে ঘরেই থাকে না। আর যদি থাকে তার ঘরে বাতি জ্বলে না।

ভাইয়া বিছানায় শুয়ে ছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, টাকা এনেছিস।

আমি অবাক হয়ে বললাম, টাকা পাও নি?

ভাইয়া বলল, তুই না দিলে পাব কোথায়? আর কাউকে তো টাকার কথা বলি নি। টাকা জোগাড় হয় নি?

আমি বললাম, না।

ভাইয়া বিড়বিড় করে বলল, বিরাট ঝামেলায় পড়ে গেলামরে।

কী ঝামেলা?

ভাইয়া জবাব দিল না। আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। ক্ষীণ গলায় বলল, মৃ বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে যা।

মার সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছে।

হ্যাঁ হয়েছে।

মা কিছু বলেছে?

তিনি উলের মোজা নিয়ে কী যেন বললেন। আসলে আমি মন দিয়ে তাঁর কথা শুনি নি।

আমি দোতলায় উঠে এলাম। দোতলার বারান্দায় গামলা ভর্তি গরম পানিতে পা ডুবিয়ে মা বসে আছেন। তাঁর পায়ে সমস্যা আছে। সামান্য হাঁটাহাটি করলেই পা ফুলে যায়। তখন জল চিকিৎসা চলে। তাঁর হাতে উলের কাটা। তিনি মোজা বুনা শুরু করেছেন।

মা আমাকে দেখে হাসিমুখে তাকালেন। আমি কঠিন গলায় বললাম, ভাইয়াকে তুমি টাকাটা দাও নি মা?

না।

তাহলে আমাকে কেন বললে দিয়েছ?

তুই খুবই মন খারাপ করে ছিলি। তোর মন ভালো করার জন্যে মিথ্যা করে। বলেছি। মানুষের মন ভালো করার জন্যে দু একটা ছোটখাট মিথ্যা বলা যায়। এতে কোনো পাপ হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে পুণ্য হয়।

আমি মার দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মোজা বুনে। যাচ্ছেন। কাজটায় অতি অল্প সময়ে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছেন এটা বোঝা যাচ্ছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললেন ভালো হচ্ছে না? মোজা বানানোর আসল রহস্য খুব সোজা। ঘর তোলা আর হিসেব করে ঘর বন্ধ করা। এই দুটা জিনিস জানলেই হলো। তুই যদি চাস তোকে আমি মোজা বানানো শিখিয়ে দিতে পারি। তোর বুদ্ধি বেশি তো। তুই খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলবি। শিখবি?

তোমার কাছ থেকে কিছুই শিখব না মা।

কার কাছে থেকে শিখবি তোর বাবার কাছ থেকে? দাড়িয়ে আছিস কেন, বোস। এতে আমার খুব লাভ হবে।

কী লাভ হবে?

নাটকে আমার সিকোয়েন্সটা হচ্ছে আমি শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থেকে উল বুনব। তুই যদি আমার সামনে বসিস তাহলে আমি তোর দিকে তাকিয়ে উল বুনব। এতে প্র্যাকটিসটা হবে।

আমি মার সামনের মোড়ায় বসলাম। মা মাথা নিচু করে অস্পষ্টভাবে হাসলেন। আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। অত্যন্ত রূপবতী একজন মহিলা বয়সের কোনো ছাপ যার চেহারায় নেই। শুধু বয়স কেন, কোনো কিছুর ছাপই তার চেহারায় নেই। দুঃখের ছাপ নেই, শোকের ছাপ নেই, আনন্দের ছাপ। নেই।

মৃন্ময়ী, তোর বাবার সঙ্গে কি তোর দেখা হয়েছে?

না।

সে ঘরে আছে। মেজাজ খুবই খারাপ।

কেন?

তোর বাবা তো বলবে না কেন তার মেজাজ খারাপ। তবে আমি অনুমান করতে পারি। দড়ি টানাটানি খেলা হঠাৎ শুরু হয়েছে। তার বাবা সবসময় ভেবেছে তার শক্তি ভালো। দড়ি টানাটানি শুরু হলে সে অনায়াসে জিতবে। এখন বুঝতে পারছে জেতা দূরের কথা, তার ফেল নিয়েই টানাটানি।

কী বলতে চাচ্ছি পরিষ্কার করে বলো তো মা।

ফেল নিয়ে টানাটানির ব্যাপারটা আগে বলি। এক ছেলে ক্লাস ফোরের ছাত্র। পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হয়েছে। রেজাল্ট এতই খারাপ হয়েছে যে হেডমাস্টার সাহেব বলেছেন এই ছেলেকে ক্লাস ফোরে রাখার দরকার নেই। এক ক্লাস নিচে নামিয়ে দিন। ছেলের বাবা

ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছেন, কী-রে বাবা পাশ করেছিস? ছেলে বিরক্ত হয়ে বলল, রাখো তোমার পাশ– আমার ফেল নিয়েই টানাটানি।

মা তুমি কী বলতে চাচ্ছ পরিষ্কার করে বলো। গল্পগুলি বাদ দাও। দড়ি টানাটানির ব্যাপারটা কী?

তোর বাবা এবং আজহার সাহেব এই দুজনের মধ্যে দড়ি টানাটানি হচ্ছে। অনেকদিন থেকেই হালকাভাবে হচ্ছিল, এখন প্রবল টানাটানি আরম্ভ হয়েছে। তোর বাবার অবস্থা কাহিল আজহার সাহেব বলতে গেলে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তোর বাবা মাটিতে পা রাখতেই পারছে না, দড়ি কী টানবে। হি হি হি।

হাসি বন্ধ করে মা।

তুই না বললেও হাসি বন্ধ করতাম। হাসতে গিয়ে আমার উল বোনায় গণ্ডগোল হয়ে গেছে। দুইটা ঘর ফেলে দিয়েছি। কী সর্বনাশ!

দুটা ঘর ফেলে দিয়েছ, তোমার বিরাট সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাই না মা! জগৎ সংসার আউলে গেছে! ছোট মানুষের ছোট জগৎ ছোট ব্যাপারেই আউলে যায়। মোজার দুটা ঘর ফেললে কারোর জগৎ আউলায়। আবার কেউ কেউ আছে কোনো কিছুতেই জগৎ আউলায় না।

মার বকবকানি শুনতে ইচ্ছা করছে না। আমি উঠতে যাচ্ছি মা হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেললেন। চাপা গলায় বললেন, তোর বাবা শেষ পর্যন্ত কবরের জায়গা কিনেছে। আজহার

সাহেবের হাত থেকে তোর বাবা বের হয়ে যাবে এটা অসম্ভব। তোর বাবা জানে না। আমি জানি।

বাবা কবরের জায়গা কিনেছেন?

হ্যাঁ।

সত্যি কথা বলছ মা?

মা জবাব দিলেন না— তিনি মোজার ফেলে যাওয়া দুটা ঘর খুঁজে পেয়েছেন। তিনি ঘর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মা যে সত্যি কথা বলছেন তা বোঝা যাচ্ছে। সত্যি বলে তিনি থেমে গেছেন, কিন্তু আমাকে একটা সমস্যায় ফেলে দিয়েছেন। মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছেন আজহার নামের বোকা টাইপের মানুষটা আমার অতি বুদ্ধিমান বাবাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বাবা বুঝতেও পারছেন না। তিনি নিজেকে রেলের ডিজেল ইঞ্জিন ভাবছেন— অতি দ্রুত এগুচ্ছেন কিন্তু যে রেল লাইনের ওপর দিয়ে তিনি যাচ্ছেন সে রেল লাইন যে অন্য একজন পেতে দিচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না।

রাতে খেতে বসে খুব সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা তুমি কবরের জন্যে জায়গা কিনেছ না-কি?

বাবা বিরক্ত গলায় বললেন, কে বলেছে?

তার মানে তুমি কিনেছ?

হ্যাঁ কিনেছি। প্রতিদিন এসে ঘ্যানর ঘ্যানর–ভালো লাগে না।

মা হাসি মুখে বললেন, তোমার তো সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল। কাফনের কাপড় আছে, কবরের ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

বাবা খাওয়া বন্ধ করে বললেন, আমার সঙ্গে ফাজলামি করবে না।

মা অবাক ভাব করে বললেন, কী ফাজলামি করলাম? যেটা সত্যি সেটা বলেছি। না-কি এ বাড়িতে সত্য বলা নিষেধ?

বাবা বললেন, তুমি কবে থেকে সত্যবাদী হয়ে গেলে?

তোমার সঙ্গে বিয়ের পর থেকে সত্যবাদী হয়েছি। তুমি সব সময় সত্যি বলো তো। তোমাকে দেখে দেখে সত্যি বলা শিখেছি।

তুমি কী বোঝাতে চেষ্টা করছ?

আমি কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছি না। শুধু বলেছি তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকে আমি সত্যি কথা বলা শিখেছি। এর আগে প্রচুর মিথ্যা বলতাম। ক্লাস টেনে বান্ধবীরা নববর্ষে সবাইকে উপাধি দেয়— আমার উপাধি কী ছিল জানো– মিথ্যারাণী!

বাবা আগুন চোখে তাকিয়ে রইলেন। মা বললেন, মনে হচ্ছে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। ক্লাস টেনে সাফিয়া নামের একটা মেয়ে পড়ত। ওর টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি। ওকে জিজ্ঞেস করো।

বাবা চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাতের এক ঝটকায়। টেবিলে রাখা ডালের বাটি মেঝেতে ফেলে দিলেন। যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে মা বললেন, করেছ কী? ডালের বাটিটাই ফেলে দিলে। ডালটাই সবচে ভালো হয়েছিল। মুরগির মাংসের বাটিটা ফেলতে। খেতে জঘন্য হয়েছে।

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, বাবা দয়া করে নিজেকে সামলাও। এবং খাওয়া শেষ করো।

বাবা বসে পড়লেন। মা বললেন, আমাকে সরি বলার কোনো দরকার নেই।

বাবা শীতল গলায় বললেন, সরি।

আমি তাকিয়ে আছি বাবার দিকে। বাবা নিজের ওপর কন্ট্রোল পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছেন। ভাত মুখে দিচ্ছেন, কিন্তু তার হাত কাঁপছে। বাবা নিচু গলায় বললেন, নানান টেনশানে থাকি। নিজের ওপর কনট্রোল কমে যাচ্ছে। আমি আসলেই দুঃখিত। এরকম আর কখনো হবে না।

সংবাদপত্রের ভাষায় এ ধরনের বক্তব্য হলো নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা। ক্ষমা প্রার্থনার পর আর কিছু থাকে না। মার মুখে বিজয়ীর হাসির পরিবর্তে বোকা বোকা হাসি দেখা যাচ্ছে। তিনি কিছু বলবেন এটা বুঝতে পারছি অনেকক্ষণ ধরেই। তিনি মনে মনে কিছু গোছাচ্ছেন। মা বাবাকে আবারো আক্রমণ করবেন এরকম মনে হচ্ছে না। টম এন্ড জেরী খেলার এইখানেই

ইতি হবার কথা। কিন্তু মাকে বিশ্বাস নেই। মা বাবার দিকে তরকারির বাটি বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, তোমার পায়ের মাপটা দিও তো।

বাবা বললেন, কেন?

মা বললেন, আমি মোজা বানানো শিখেছি। তোমার জন্যে উলের মোজা বানিয়ে দেব। চা বাগান কিনেছ। শীতের সময় ঐ সব অঞ্চলে খুব শীত পড়ে। উলের মোজা পায়ে থাকলে শীতের হাত থেকে বাঁচবে।

বাবা মার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, থ্যাংক য় ফর দ্যা কাইন্ড থট।

আমি মোজা বানানো কার কাছ থেকে শিখেছি জানলে তুমি খুবই অবাক হবে।

বাবা খাওয়া বন্ধ করে মার দিকে তীক্ষ চোখে তাকালেন। আমিও তাকলাম। টম এন্ড জেরী খেলা এখনো শেষ হয় নি। মার মুখে আনন্দময় হাসি। মা হাসি হাসি মুখে বললেন, মোজা বানানো শিখেছি টগরের মার কাছে। টগরের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে উনাকে খুঁজে বের করলাম। খুব গুণী মহিলা। অনেক কিছু জানেন। ছোট মাছ আর জলপাই দিয়ে একটা টক করেন। তুমি না-কি সেই টক খুব শখ করে খেতে।

বাবা তাকিয়ে আছেন। কিছু বলছেন না। পরিস্থিতি বিচার করছেন। মা বললেন, এখন শিখে এসেছি তোমার যখন খেতে ইচ্ছা করে বলবে বেঁধে খাওয়াব।

বাবা বললেন, থ্যাংক যা এগেইন।

মা বললেন, আরেকজনের কাছে মুরগি রান্নার একটা রেসিপি জোগাড় করেছি। এটাও না-কি তোমার খুব প্রিয়।

বাবার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। মার মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই। তিনি এখন আর বাবার দিকে তাকাচ্ছেন না। তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

মৃ শুনে রাখ। তোর যা বুদ্ধি একবার শুনলেই মনে থাকবে। তখন তুই তোর প্রিয়জনকে বেঁধে খাওয়াবি। তোর গরু স্যারকে বেঁধে খাওয়াতে পারিস। রেসিপিটা হচ্ছে একটা মাঝারি সাইজের মুরগি নিবি। আস্ত মুরগিটার চামড়া খুলে ফেলবি। তারপর মুরগিটার গায়ে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশটার মতো ফুটা করবি। প্রতিটা ফুটায় একটা করে রসুনের কোয়া ঢুকিয়ে দিবি। তারপর টক দই দিয়ে মুরগিটা মাখিয়ে একটা ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে পেঁচিয়ে ফ্রিজে রেখে দিবি। মুরগি ফ্রিজে থাকবে বার ঘণ্টা...

বাবা কঠিন গলায় বললেন, স্টপ ইট।

মা চুপ করে গেলেন।

৬. আফাগো আফা

কে যেন চাপা গলায় ডাকছে, আফাগো আফা।

তস্তুরী বেগমের গলা। বালিশের নিচে আমার হাতঘড়ি। রেডিয়াম ডায়ালের চল উঠে গেছে। রেডিয়াম স্বাস্থ্যের জন্যে হানিকর। সময় দেখতে হলে বাতি জ্বালাতে হবে। বাতি জ্বালাতে ইচ্ছা করছে না। ঘড়ি না দেখেই বুঝতে পারছি অনেক রাত। আমি ঘুমুতে গেছি রাত একটায়। অনুমান করছি দুঘণ্টার মতো ঘুমিয়েছি, কাজেই রাত তিনটা হবে। রাত তিনটায় তস্তুরী বেগম আমাকে কেন ডাকবে? কোনো ইমার্জেলি? বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? কিছুদিন পর পর বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি নিঃশ্বাস নিতে পারেন না। বিছানায় ছটফট করতে থাকেন। তখন চারদিকে হৈচৈ পড়ে যায়। বারান্দার সব বাতি জ্বালানো হয়। কয়েকজন ডাক্তারকে খবর দেয়া হয়। এ্যাম্বুলেন্স চলে আসে। অক্সিজেন চলে আসে। তখন বাবা সুস্থ হয়ে ওঠেন। বিছানায় উঠে বসে স্বাভাবিক গলায়। বলেন, এক গ্রাস পানি দেখি। নরমাল পানির সঙ্গে এক টুকরা বরফ দিও।

ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। তখন বাবা বলেন, দেখি একটা সিগারেট।

আজকেও এরকম কিছু কি হয়েছে?

তস্তুরী বেগম আবার ডাকল, আফাগো আফা। দরজা খুলেন।

আমি দরজা খুললাম না। ব্যাপার আঁচ করতে চাচ্ছি। বারান্দায় হাঁটার শব্দ পাচ্ছি। চটি পায়ে হাঁটা। বাবা হাঁটছেন। তার অর্থ হলো তিনি সুস্থ আছেন। আমার ঠিক ঘরের সামনে চেয়ার টেনে কে যেন বসল। সম্ভবত মা। মা বসার আগে চেয়ার একটু সরাবেন। চেয়ারটা যেখানে আছে ঠিক সেখানে বসবেন না।

বাবা-মা দুজনই জেগে আছেন। ব্যাপার কী? আমি দরজা খুললাম। তস্তুরী বেগম বলল, বাড়ি ভর্তি পুলিশ আফা। চেকিং হইতেছে।

মা চেয়ারে শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন। বাবা বারান্দায় নেই। মনে হয় নিচে গেছেন।

মা আমাকে দেখে আঁৎকে ওঠার মতো করে বললেন, তোর গালে এটা কি মশার কামড় না পিম্পল?

বাড়ি পুলিশ ঘিরে আছে। প্রতিটি ঘর সার্চ করা হচ্ছে। এসব যেন কোনো বিষয়ই না। আমি বললাম, পুলিশ কেন মা?

মা হাই তুলতে তুলতে বললেন, আমি কী জানি পুলিশ কেন? তোর বাবা জানে। তোর বাবার সঙ্গে পুলিশ অফিসারের কথা হয়েছে।

বাবাকে জিজ্ঞেস করো নি?

না।

ভাইয়ার কোনো বন্ধুর খোঁজ করছে?

জানি না।

ভাইয়া কোথায় সেটা জানো? নাকি সেটাও জানোনা?

টগরকে তো পুলিশ আগেই নিয়ে গেছে।

আগেই নিয়ে গেছে মানে কী? কখন নিয়ে গেছে?

দশ-পনের মিনিট হলো নিয়ে গেছে। বেশ ভদ্রভাবেই নিয়েছে। পুলিশ এরেস্ট করার সময় হাতকড়া পরায়, কোমরে দড়ি বাঁধে। সেসব কিছুই করে নি।

আমি নিচে নামলাম। বাবা একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি ইশারায় আমাকে চলে যেতে বললেন। বাবাকে খুব বিচলিত মনে হলো না। তিনি কোনো বড় ঝামেলায় পড়েছেন এমন কোনো ছাপ তার মুখে নেই। আমি আবারও দোতলায় উঠে এলাম। মা শুকনো মুখ করে বললেন, রাতের ঘুমটা আমার দরকার ছিল। কাল শুটিং। না ঘুমালে মুখ চিমসা হয়ে থাকবে। আমি বরং তোর ঘরে শুয়ে থাকি।

শুয়ে থাকো।

ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে থাকি। শুয়ে থাকলাম– ঘুম হলো না, এটাতো কাজের কথা না। কী বলিস।

তোমার যা ইচ্ছা করো মা। বিরক্ত কোরো না। প্লিজ।

তুই জেগে থেকে কী করবি? তুইও শুয়ে পড়। যা করার তোর বাবাই করবে। পুলিশকে টাকা খাওয়াতে হবে।

মা তুমি ঘুমাও। আমি বাবার জন্যে অপেক্ষা করব।

যা ইচ্ছা কর। আমাকে ঘুমাতেই হবে।

তস্তুরী বেগম খুব ভয় পেয়েছে। সে একটু পর পর বারান্দায় এসে আমাকে দেখে যাচ্ছে। ভীতু মানুষরা সাহসী মানুষদের আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে। সে হয়তো আমাকে খুব সাহসী ভাবছে। একবার একটা বই পড়েছিলাম, বইটার নাম Anatomy of fear, ভয় কত রকম কী তার ব্যাখ্যা। বইটার লেখক বলছেন, সব মানুষের ভেতর কিছু আদিম ভয় লুকিয়ে থাকে। সে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই ভয় লালন করে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সেই আদিম ভয়ের মুখোমুখি হয়।

আফাগো, চা কফি কিছু খাইবেন?

চা খাব, আমার জন্যে আর বাবার জন্যে বানিয়ে নিয়ে এসো। তুমি কি খুব ভয় পেয়েছ?

পাইছি আফা। ভয়ে আমার শইল কাঁপতেছে। ভয় পাবার কিছু নেই। তোমাকে তো পুলিশ কিছু বলবে না।

পুলিশের কি কিছু ঠিক আছে আফা? এরা জালিম এরা করতে পারে না। এমন কাম নাই।

যাও চা নিয়ে এসো। পুলিশ কি এখনো আছে না চলে গেছে?

পুলিশের বড় সাব অখনো আছে। খালুজানের সঙ্গে কথা বলতেছে। উনারেও কি চা দিব আফা?

না। তুমি এখন যাও।

তস্তুরী বেগমের মনে হয় যেতে ইচ্ছা করছে না। সে নিতান্ত অনিচ্ছায় বারান্দা থেকে বের হলো।

রাত তিনটা চল্লিশ। এর মধ্যেও খবর হয়ে গেছে। বাড়ির চারপাশে লোক জমে গেছে। হৈচৈ হচ্ছে। প্রচুর রিকশা জড়ো হয়েছে। কয়েকজন আবার দেয়ালে চড়ে বসেছে। আমাদের দারোয়ান লাঠি উচিয়ে তাদেরকে নামাচ্ছে।

আমি জানি পুলিশ চলে যাবার পরও এই ভিড় কমবে না। বাড়তে থাকবে। নানান ধরনের গুজব মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবে। সকাল নটা দশটা বাজতেই পত্রিকার লোকজন চলে আসবে।

বাবা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছেন। আমি বাবাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাবা বললেন, কী-রে জেগে আছিস।

হ্যা, জেগে আছি। হয়েছে কী বাবা?

তেমন কিছু না। পুলিশ টগরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ওর বন্ধু-বান্ধব তো ভয়ঙ্কর। বন্ধুদের কেউ হয়তো ধরা পড়েছে। টগরের নামে কিছু বলেছে।

তোমার মধ্যে কোনো টেনশন নেই কেন বাবা?

বাবা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, এ রকম ঘটনা যে ঘটবে তাতে আমি অনেক দিন থেকেই জানি। কাজেই বিস্মিত হই নি।

মৃত্যু যে ঘটবে তা কিন্তু আমরা সবাই জানি। তারপরেও মৃত্যু যখন ঘটে তখন কিন্তু আমরা খুবই বিস্মিত হই। তোমার মধ্যে বিস্ময়ও নেই।

বিস্ময় নেই?

না নেই, বরং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুশি হয়েছ।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, আমাকে দেখে মনে হয়েছে আমি খুশি হয়েছি?

হ্যাঁ, সে রকমই মনে হচ্ছে। তোমার পরিকল্পনামতো একটা কাজ শেষ হয়েছে। সেই আনন্দে তোমাকে আনন্দিত মনে হয়েছে।

বাবা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। তস্তুরী বেগম চা নিয়ে এসেছে। বাবা বিরক্ত মুখে বললেন–চা খাব না। বলেই মত বদলালেন। তস্তুরী বেগমকে বললেন, আচ্ছা এনেছ যখন রাখো। বরফ আর গ্লাস আমার ঘরে দিয়ে এসো।

আমি তাঁর সামনেই বসে আছি। তিনি আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। এমনভাবে সিগারেট টানছেন যেন তার আশেপাশে কেউ নেই। চায়ের। কাপটাকে তিনি ছাইদানি হিসেবে ব্যবহার করছেন। এই কাজও তিনি কখনো করেন না। একজন গোছানো মানুষ চায়ের কাপে সিগারেটের ছাই ফেলবে না। সে নিজে উঠে ছাইদানি নিয়ে আসবে কিংবা কাউকে আনতে বলবে।

বাবা আমার ওপর রাগ দেখাচ্ছেন। রাগ দেখানোর পদ্ধতির মধ্যেও ছেলেমানুষি আছে। রাত প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে এই সময়ে তিনি তাঁর ঘরে বরফ দিতে বললেন। এটিও রাগ দেখানোর অংশ। মেয়েকে বুঝিয়ে দেওয়া আমি তোমার কথায় আহত হয়েছি। এখন মদ্যপান করব। যদিও এই কাজটা তিনি কখনো করবেন না। তার সব কিছুই পরিমিতির মধ্যে। মদ সপ্তাহে একদিন খাবেন। কখনো দু পেগের বেশি খাবেন না। কখনো হৈচৈ করবেন না। মাতাল হওয়া তো অনেক পরের ব্যাপার। বাবার মতো মানুষরা সীমা অতিক্রম করার আনন্দ জানে না।

বাবার সিগারেট খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় হনহন করেই ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি একা বারান্দায় বসে রইলাম। আমার কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। আমাদের বাসায় ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটেছে। আমার ভাইকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে এ জাতীয় কথা না। অন্য ধরনের কথা। আমি জেগে আছি, একা বারান্দায় বসে আছি— এই খবরটা কাউকে জানানো। অন্তত একজন কেউ জানুক আমার মন ভালো নেই। কী জন্যে ভালো নেই সেটা জানানোর কোনোই প্রয়োজন নেই। মন ভালো নেই এই খবরটা শুধু জানান। কিছু অর্থহীন কথা বলা। কী বলা হচ্ছে তা জরুরি না, গলার শব্দ শোনানোটা জরুরি। কথা বলা-কথা বলা খেলা।

তস্তুরী আবারো এসেছে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রায় ফিসফিস করে বলল, আফা ঘুমাইবেন না?

না ঘুমাব না। তুমি শুয়ে পড়।

ভাইজানরে নিয়া মারধোর করতেছে কি-না কে জানে!

না মারধোর করবে না। বাবা অবশ্যই এই ব্যবস্থা করেছেন। তুমি ঘুমুতে যাও।

আফনেরে একটা কথা বলব আফা। বলতে ভয় লাগতেছে। না বইল্যাও পারতেছি না।

বলো।

পুলিশ যখন বাড়ি ঘেরাও দিছে তখন ভাইজান কাপড় দিয়া পেঁচাইয়া একটা জিনিস রাখতে দিছে। জিনিসটা কী করব আফা?

কী জিনিস?

তস্তুরী বেগম চুপ করে আছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আমি বললাম, বোমা পিস্তল জাতীয় কিছু? তস্তুরী বেগম জবাব দিল না। এখন সে আমার দিকে তাকাচ্ছে না। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

রেখেছ কোথায়?

চাউলের টিনের ভিতরে।

থাকুক সেখানেই। সকাল হোক তখন একটা ব্যবস্থা হবে।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। আমি আগের জায়গাতেই বসে আছি। বাবা যে জেগে আছেন সেটা বুঝতে পারছি। বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। তিনি আমার সব ধারণা ভেঙে দিয়ে প্রায় মাতাল অবস্থায় ঘর থেকে বের হলেন। আমাকে জেগে বসে থাকতে দেখে খুবই অবাক হলেন। কাছে এসে কোমল গলায় বললেন, এখনো জেগে আছিস না-কি রে মা! দুশ্চিন্তা করছিস। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। সব আমার হাতের মুঠোর মধ্যে আছে। যা দেখছিস সবই পাতানো খেলা।

পাতানো খেলা মানে!

বাবা আমার সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, পুলিশকে আমিই খবর দিয়ে এনেছি। আমার কথামতোই তারা টগরকে ধরে নিয়ে গেছে। তুই যে বলেছিলি, আমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি আনন্দিত। আসলেই আমি আনন্দিত। বুঝলি মৃ, তোর বুদ্ধি ভালো। শুধু ভালো বললে কম বলা হয়–খুব ভালো। আমি তোর বুদ্ধি দেখে খুবই অবাক হয়েছি। বলতে গেলে চমকেই গেছি।

আমি সহজ গলায় বললাম, পুলিশ ডেকে ভাইয়াকে এরেস্ট করিয়েছ কেন?

বাবা গলা নিচু করে বললেন, ও যেন নিরাপদে থাকতে পারে। এইজন্যেই কাজটা করিয়েছি। ষাট হাজার টাকা সে চেয়েছে–তার মানে সে বিরাট বিপদে আছে। হাজতে ঢুকিয়ে তাকে আমি বিপদ থেকে আলাদা করে ফেললাম।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা।

সব তোর বোঝার দরকার নেই। নানান ধরনের খেলা এই পৃথিবীতে চলে। সব খেলা বুঝতে হবে এমন কোনো কথা আছে? সব খেলা বোঝার চেষ্টাও করতে নেই।

বাবা তৃপ্তির হাসি হাসছেন। নেশাগ্রস্ত মানুষরা অল্পতেই তৃপ্তি পায়। তৃপ্তি প্রকাশ করে ফেলে। চেষ্টা করেও গোপন রাখতে পারে না। বাবা আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, কিছু খেলা থাকে সাধারণ। উদাহরণ হলো তোর মা। ছোটখাট খেলা সে খেলে–খুবই নিম্ন মানের।

তুমি খুব উঁচু মানের খেলা খেল?

অবশ্যই।

খেলাটা তুমি কার সঙ্গে খেলছ? নিজের সঙ্গে নিশ্চয়ই খেলছ না। তোমার একজন প্রতিপক্ষ আছে। সেই প্রতিপক্ষটা কে? আজহার চাচা?

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিকই ধরেছি। আজহার খুবই ওস্তাদ খেলোয়াড়। তবে সে বোকা। আসলেই বোকা।

বোকা হলেও তুমি কিন্তু বাবা তার হাতের মুঠোয়।

বুঝলি মা এটাও আমার খেলার একটা স্ট্রাটেজি। আমি ইচ্ছা করে তার হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছি।

মার কাছে শুনলাম আজহার চাচা তার ছেলের বিয়ের তারিখ ঠিক করতে এসেছিলেন। খেলার স্ট্রাটেজি হিসেবে তুমি নিশ্চয়ই তারিখও ঠিক করেছ। তারিখটা কী?

বাবা চুপ করে গেলেন। সিগারেট ধরালেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, তারিখ ঠিক করার কথা তোকে কে বলেছে? নিশ্চয়ই তোর মা। সে আর কী বলেছে?

না। আর কিছু বলেন নি। আরো কিছু কী বলার আছে?

বাবা কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ব্যাপারটায় সামান্য জটিলতা আছে। খুবই সামান্য।

বলো শুনি।

তোর মা তোক কিছু বলে নি?

না।

আচ্ছা তোক ব্যাপারটা বলি–ইউনিভার্সিটির চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নেমে পড়লাম। ভয়াবহ রিস্ক নিলাম। এই সময় আজহার আমাকে সাহায্য করল। বোকা হলেও ওর ব্যবসা বুদ্ধি

ভালো। এই লাইনে তার চিন্তা-ভাবনা খুবই পরিষ্কার। একবার ব্যবসার একটা বড় ঝামেলা থেকে সে আমাকে বাঁচাল। আমি বললাম, আজহার তুমি বিরাট বিপদ থেকে বাঁচিয়েছ আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি বলো। আজহার বলল, তোমার মেয়েটাকে আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দাও। মেয়েটাকে আমার বড়ই পছন্দ। আমি বললাম, কোনো সমস্যা নেই। এই মেয়ে তোমার। এই হলো ঘটনা।

আমি বললাম, বড় কোনো ঘটনা তো না। সব বাবা মা-ই ছেলেমেয়ে ছোট থাকলে বিয়ে বিয়ে খেলা খেলে। তুমি এটাকে এত গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছ কেন?

গুরুত্বের সঙ্গে তো নিচ্ছি না। গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি তোকে কে বলল?

বলার ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে তুমি গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছ।

বাবা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আজহার যেটা ধরে সেটা ছাড়ে না। বিয়ের ব্যাপারটা সে ছাড়ল না। যখনই বড় কোনো বিপদে পড়ি সে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে তারপর তার ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যাপারটা মনে করিয়ে দেয়। আমি বলি, সব ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই। তারপর একদিন। আজহার বলল, এক কাজ করি মওলানা ডাকিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দেই। আমি বললাম, তা কী করে হয়? দুজনই শিশু–এদের বিয়ে হবে কীভাবে? সে বলল, বাপ-মায়ের ইচ্ছায় বিয়ে হবে। বাবা-মার জন্যেই এরা পৃথিবীতে এসেছে। বাবা-মার অধিকার আছে তাদের বিয়ে দেবার। ফালতু যুক্তি।

আমি শান্ত গলায় বললাম, তারপর কী হলো? মওলানা এসে বিয়ে পড়িয়ে দিল।

অনেকটা সেরকমই। বিয়ে বিয়ে খেলা। বিড়ালের বিয়ে হয় না? সে রকম আর কি?

মা বিয়েটা মেনে নিল?

তোর মা খুবই চিৎকার চেঁচামেচি করেছে। বিয়েটাকে আমি তেমন গুরুত্ব দেই নি। তার মার চেঁচামেচিকেও গুরুত্ব দেই নি।

এখন বিয়েটাকে গুরুত্ব দিচ্ছ?

পাগল হয়েছিস না-কি? গুরুত্ব দেব কী জন্যে? আইনের চোখে এ বিয়ে অসিদ্ধ। আজহার একটা খেলা আমার সঙ্গে খেলেছে। ব্যাপারটা আমার বুঝতে সময় লেগেছে। একেবার যে মহাবিপদে পড়েছি বিপদগুলিও তারই তৈরি করা। সে আমাকে ফেলেছে, আবার সে-ই টেনে তুলেছে। দাবা খেলায় হারজিৎ কোথায় ঠিক হয় জানিস? এন্ড গেম-এ। মিডল গেমে আমি ধরা খেয়েছি। এন্ড গেমে আজহার ধরা খাবে। তুই কি ভেবেছিস সে শুধু শুধু আমাকে কাফনের কাপড় দিয়েছে? কবরের জন্যে জায়গা কিনে দিয়েছে। সে একটা ম্যাসেজ আমাকে দেবার চেষ্টা করছে। সে আমাকে একটা ওয়ার্নিং দিল।

বাবা আরেকটা সিগারেট ধরালেন। আমি বাবার সামনে থেকে উঠে গেলাম। ছাদে যাব। অনেক দিন ভোর হওয়া দেখা হয় নি। আজ সুযোগ পাওয়া গেছে।

এই মুহূর্তে কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। খুব কাছের কোনো মানুষ—Sentinental friend.

৭. আকাশে মেঘ করেছে

আকাশে মেঘ করেছে। শহরের মানুষ চারদিকে তাকায়, আকাশের দিকে তাকায়। না। কখন আকাশে মেঘ করে কখন মেঘ কেটে যায় বুঝতেই পারে না। আজ মেঘ করেছে আয়োজন করে। যেন মেঘমালা উঁচু গলায় বলছে হে নগরবাসী! তাকাও আমার দিকে।

নগরবাসী মেঘ দেখছে কি-না আমি জানি না। তবে আমি দেখছি। মনে হচ্ছে আজ ঘন বর্ষণ হবে। এই বর্ষণ দিয়েই কি আষাঢ়ের শুরু?

আমি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছি। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। শহরে খুব ডেঙ্গুর উপদ্রপ। জ্বর হলেই সবাই আঁতকে উঠে ভাবে ডেঙ্গু না-কি? আমার সে রকম কিছু হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে ডেঙ্গু হলে ভালোই হয়। কিছু দিন হাসপাতালে কাটিয়ে আসা যায়। সম্পূর্ণ নতুন কোনো পরিবেশ। এই পরিবেশে আর থাকতে ইচ্ছা করছে না। দম বন্ধ লাগছে।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের নানান অবস্থা থাকে শুককীট, মূককীট, পতঙ্গ। একটা অবস্থার সঙ্গে অন্য অবস্থার কোনো মিল নেই। মানুষের জন্যে এ রকম ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো। কিছু দিন সে একটা অবস্থায় থাকল, একদিন হঠাৎ বদলে অন্য রকম হয়ে গেল। অন্য একটা জীবন। আগের জীবনের সঙ্গে কোনো মিল থাকল না।

বাড়িতে আমি একা। বাবা সিলেটে, তার চা বাগানে কী যেন সমস্যা হয়েছে। তিনি গেছেন সমস্যা মিটাতে। এক সপ্তাহ সেখানে থাকবেন। মা গেছেন শুটিং-এ। আজ তার মোজা বোনার অংশটা রেকর্ড করা হবে। কাজ কী রকম হচ্ছে একটু পরে পরেই তিনি টেলিফোন

করে জানাচ্ছেন বুঝলি মৃ, মেকাপ দিয়েছে। ঠোঁটে দিয়েছে কড়া লাল লিপস্টিক। আমি বললাম, একজন বয়স্ক মহিলা এমন গাঢ় রঙের লিপস্টিক পরবেন? আমার কথায় মেকাপম্যান। এমনভাবে তাকাল যেন আমি ব্লাসফেমি করেছি। তারপর বলল ঠোঁটে লিপস্টিক না দিলে টিভির পর্দায় ঠোট শাদা দেখাবে। আমি চুপ করে রইলাম। ওদের কাজ ওরাই তো ভালো জানবে। স্টিল ক্যামেরাম্যান ছবি তুলেছে। আমি তাকে বলেছি আমার একটা ছবি টেন টুয়েলভ সাইজ করে আমাকে দিতে। অভিনয়ের স্মৃতি থাকুক। কী বলিস?

মার কথা শুনে আমার হিংসা হচ্ছে। তিনি তাঁর জীবনটা সুখেই কাটিয়ে দিচ্ছেন। সব কিছুর মধ্যে থেকেও তিনি কোনো কিছুর মধ্যেই নেই। ভাইয়া হাজতে আছে, তাকে একদিনও দেখতে যান নি। তার প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। যেন এ রকম কিছুই ঘটে নি। সংসার আগে যেমন চলছিল এখনো

সে রকমই চলছে।

আমি একদিনই ভাইয়াকে দেখতে গিয়েছি। পুলিশ অফিসার আমার সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করেছেন। আমাকে হাজতে লোহার শিক ধরে ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলতে হয় নি। একটা আলাদা ঘরে বসতে দেওয়া হয়েছে। ভাইয়াকে আনা হয়েছে সেখানে। আমাদের জন্যে কেক এবং চা দেওয়া হয়েছে।

ভাইয়া আমাকে দেখে হাসল। আমি বললাম, কেমন আছ?

ভাইয়া তার জবাবেও হাসল। তার গালে খোচা খোঁচা দাড়ি। চুল আঁচড়ানো নেই। তারপরেও তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। ভাইয়ার কারণে যেন ঘরটা আলো হয়ে গেছে। আমি বললাম, তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না?

ভাইয়া বলল, না। তবে রাতে খুব মশা কামড়ায়। এখানে মশারির ব্যবস্থা নেই। কয়েল জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। এতে কাজ হয় না। কয়েলের গন্ধে দল বেঁধে মশা আসে।

আমি বললাম, তুমি তস্তুরী বেগমকে একটা জিনিস রাখতে দিয়েছিলে সেটার কী হবে?

ভাইয়া আবারো হাসল। এই হাসির নিশ্চয়ই কোনো মানে আছে। আমি মানে বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে এই প্রসঙ্গ নিয়ে সে কথা বলতে চাচ্ছে না।

আমি বললাম, তোমার মাকে কি খবর দেব ভাইয়া? তিনি এসে তোমাকে দেখে যাবেন।

না।

কোঁকড়া চুলের তোমার ঐ বন্ধুটাকে আমার খুব দরকার। ওকে কোথায় পাব বলতে পারো?

না।

ঠিকানা জানোনা?

ওর কোনো ঠিকানা নেই।

নামটা বলো।

নাম দিয়ে কী হবে?

কিছুই হবে না। নাম জানতে ইচ্ছা করছে।

ওর নাম টুলু।

ভাইয়া খুব আগ্রহ করে চায়ে ডুবিয়ে কেক খাচ্ছে। তার ঠোঁটের কোনায় হাসি লেগেই আছে। আমি বললাম, ভাইয়া তুমি আমাকে একটা কথা বলো তো— তুমি কি তোমার বন্ধুদের মতো বড় ধরনের কোনো অপরাধ করেছ?

ভাইয়া চা-য়ে চুমুক দিয়ে বলল, তোর কী মনে হয়?

আমি সহজ গলায় বললাম, আমার এখন তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি করেছ। শুধু যে করেছ তা না, তুমি ওদের লীডার জাতীয় কেউ। আড়ালে বসে সুতা খেলাও।

ভাইয়া আবারো হাসল। আমি বললাম, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাও নি।

ভাইয়া বলল, যে আমাকে যা ভবে আমি সে রকম।

আমি বললাম, এটা তো প্রশ্নের উত্তর হলো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম নেপাল দেশটা কোথায়? তুমি বললে যেখানে নেপালের থাকার কথা সেখানে।

তুই খুব সুন্দর করে কথা বলিস, তোর খুব বুদ্ধি।

তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দেবে না?

এখন দেব না। কোনো একদিন হয় তো দেব। কিংবা জবাব দিতে হবে না। নিজেই জবাব পেয়ে যাবি।

আমি ভাইয়ার দিকে ঝুঁকে এসে বললাম, তুমি কি জানো ছোটবেলায় আমার বিয়ে হয়েছিল?

ভাইয়া সহজ গলায় বলল, জানি। আজহার চাচার ছেলের সঙ্গে। ওটা তো বিয়ে না। বিয়ে বিয়ে খেলা।

সব কিছুই তো খেলা।

তোর মতো বুদ্ধি আমার নেই। ফিলসফির কথা আমি কিছুই বুঝি না। তবে এই বিয়ে নিয়ে তুই মোটেও চিন্তা করবি না। ওটা কোনো ব্যাপার না। মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। তুই তোর ঐ টিচারটাকে বিয়ে করে ফেল।

টিচারের কথা তুমি জানলে কীভাবে?

ভাইয়া আবারও হাসল। আমি বললাম, ভাইয়া তুমি ঘর অন্ধকার করে চুপচাপ বসে থাক। কিন্তু তুমি অনেক কিছু জানো। তাই না?

তা জানি। মৃ শোন, ছোটবেলার বিয়েটা নিয়ে তুই মোটেও ভাববি না। বাবা তোকে পাগলের মতে ভালবাসেন। তোর কোনো রকম সমস্যা বাবা হতে দেবেন না। এই বিষয়টা নিয়ে তুই আর ভাববি না।

আমি নিচু গলায় বললাম, ব্যাপারটা ভুলতে পারছি না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কোনোদিন যদি আজহার চাচার ছেলেটা এসে বলে, মৃন্ময় এসো তোমাকে নিতে এসেছি। তাহলে আমি তার সঙ্গে চলে যাব।

পাগলের মতো কথা বলবি না।

যেটা সত্যি আমি সেটাই বলছি।

অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। এখন বাসায় যা। মাথা ঠিক রাখ। ভালো কথা, টুনু এসে আমার জিনিসটা নিয়ে যাবে।

কবে আসবে?

আসবে কোনো একদিন। আজও আসতে পারে।

ভাইয়া, সেও কি তোমার মতো? প্রশ্ন করলে জবাব দেয় না।

প্রশ্ন করে দেখিস। সে তোকে খুব পছন্দ করে। তুই না-কি একদিন তাকে খুব যত্ন করে ভাত খাইয়েছিলি।

হ্যাঁ।

ঘটনাটা বলতে বলতে টুনু কেঁদে ফেলেছিল। কেঁদে ফেলে সে নিজের উপর খুবই রেগে গেল। তারপর করল কী ঠাশ ঠাশ করে দেয়ালে মাথা ঠুকে মাথা ফাটিয়ে ফেলল। হা হা হা।

এর মধ্যে হাসির কিছু নেই ভাইয়া, আসবে না।

আচ্ছা যা হাসব না।

ভাইয়া তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি কোথায় যাব জান?

জানি না তবে অনুমান করতে পারি।

আচ্ছা অনুমান কর তো দেখি।

প্রথম যাবি শালবনের দিকে। কিছুক্ষণ একা একা ঘুরবি। হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে। তারপর যাবি আজহার চাচার কাছে। এটা কি হয়েছে?

হ্যাঁ এটাও হয়েছে। আর কোথায় যাব বল। শেষটা বলতে পারলে আমি ধরে নেব তোমার ইএসপি পাওয়ার আছে।

তুই আমার মা-কে দেখতে যাবি। হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে। মা-র সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিস কেন?

এম্নি। কোনো কারণ নেই। তুমি বাবার কাছ থেকে কতটুকু পেয়েছ, আর মা-র কাছ থেকে কতটুকু পেয়েছ এটা আমার জানার শখ।

একদিন দেখেই সব বুঝে ফেলবি?

না তা বুঝব না। তবে চেষ্টা করে দেখব।

ভাইয়া হাসিমুখে বসে আছে। পা নাড়ছে। মনে হলো হাজত ঘরে থেকে সে খুব মজা পাচ্ছে।

হাজত থেকে বের হয়েছি। ওসি সাহেব আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছেন। স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ থেকে তিনি যে এটা করছেন তা মনে হচ্ছে না।

ম্যাডাম আপনি আপনার ভাই এর ব্যাপারে মোটেও চিন্তা করবেন না।

আমি চিন্তা করছি না।

তাকে যতটুকু সুবিধা দেয়া যায় আমরা দিচ্ছি।

আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, কেন দিচ্ছেন?

ওসি সাহেব প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মনে হলে তিনি কেমন যেন। ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেছেন। তিনি প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন, ম্যাডাম আপনার যখনই ভাইকে দেখতে ইচ্ছা করলে আপনি চলে আসবেন। আমি যদি নাও থাকি অসুবিধা হবে না। আমি ইন্সট্রাকশান দিয়ে দেব।

থ্যাংক য়্যু।

আমার গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ওসি সাহেব হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। সুন্দর একজন মানুষ। পুলিশের পোশাক ফেলে পায়জামা পাঞ্জাবি পরলেই তাঁকে মনে হবে কোনো এক প্রাইভেট কলেজের বাংলার অধ্যাপক। পুলিশ এবং মিলিটারিদের যেমন পোশাক আছে অন্য সবারই তেমন পোশাক থাকলে। ভালো হতো। পোশাক দেখেই বোঝা যাবে তার পেশা কী। শুধু পুলিশ এবং মিলিটারিদের আমরা চিনব আর অন্যদের চিনতে পারব না, তা কেন হবে? কেরানিদের এক রকম পোশাক হবে, বড় সাহেবদের আরেক রকম, সন্ত্রাসীদের আরেক রকম। আমরা সবাই সবাইকে চিন। কোনো রাখ ঢাক থাকবে না।

আপা কোনদিকে যাব?

আমি ঠিকানা দিয়ে দিলাম। ভাইয়ার মা-র ঠিকানা। দ্রমহিলাকে আমি কী ডাকব? মা ডাকব? নাকি অন্য কিছু?

ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে। দুবার সে মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। আমাকে কি খুব দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে? অস্বাভাবিক লাগছে? নিজের মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা বোধ করছি।

ভাইয়ার মা-র কাছে এখন আর যেতে ইচ্ছা করছে। না। উনার কাছে কেন যেতে চাচ্ছিলাম তাও বুঝতে পারছি না।

অপরিচিত একজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার জন্যে কি যেতে চাচ্ছিলাম? হতে পারে। বিশেষ বিশেষ সময়ে নিতান্ত অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে। নিতান্ত অপরিচিত জনকে মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা গোপন কথা বলে ফেলা। এই ভরসায় বলা যে এর সঙ্গে বাকি জীবনে আর কখনো দেখা হবে না।

বিদেশে এমন ব্যবস্থা আছে। টেলিফোনে কথা বলার সঙ্গী। কাউন্সেলার। কোনো একটা সমস্যা হলো। টেলিফোনে বিশেষ বোতাম টিপলেই মনোেযোগী শ্রোতা পাওয়া যাবে যে উপদেশ দেবে। উপদেশ না চাইলে শুধুই শুনবে। বাংলাদেশে এমন ব্যবস্থা থাকলে আমি টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে হড়বড় করে অনেক কথা বলতাম।

এই যে শুনুন হ্যালো, আজ আমার খুব মন খারাপ।

খুব কি বেশি খারাপ?

হ্যাঁ খুব বেশি খারাপ। এখন আমি গাড়িতে বসে আছি। কিন্তু আমার ইচ্ছা করছে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

গাড়ি করে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

একজন মহিলার কাছে যাচ্ছি।

আপনার প্রিয়জনদের কেউ?

না তার সঙ্গে আমার আগে কখনো দেখা হয় নি। আজ প্রথম দেখা হবে।

আপনার কি ধারণা তার সঙ্গে দেখা হলে আপনার মন খারাপ ভাবটা কমবে?

আমার কোনো ধারণা নেই।

কী নিয়ে আপনার মন খারাপ সেটা কি আপনি বলবেন?

না বলব না।

ড্রাইভার ব্রেক কষে গাড়ি থামাল। আমরা মনে হয় এসে পড়েছি। আমার গাড়ি থেকে নামতে ইচ্ছা করছে না। কী হবে নেমে? আমি বললাম, ড্রাইভার সাহেব শালবনের দিকে চলুন। আমার ঘুম পাচ্ছে। আধো ঘুম, আধো জাগরণে আমি গা এলিয়ে পড়ে আছি।

টুনু নামের ছেলেটা জিনিসটা নিতে এলো সেদিনই। কী সহজ সরল মুখ। লাজুক ভঙ্গি। ভাইয়ার ঘরে বসেছিল, আমাকে দেখেই চট করে উঠে দাঁড়াল। যেন সে স্কুলের ছাত্র। আমি সেই স্কুলের হেড মিসট্রেস।

আমি বললাম, জিনিসটা আপনার?

সে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। আমি বললাম, নতুন কোনো এসাইনমেন্টে যাচ্ছেন? কত টাকার এসাইনমেন্ট?

সে জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, একটা কাজে আপনি কত টাকা নেন জানতে পারি?

সে বলল, আমি যাই।

ভাইয়া তো ঘরে নেই। আপনার যত্ন করারও কেউ নেই। আমি আপনাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারি। না-কি আপনাকে এক্ষুণি যেতে হবে? আপনার কি খুবই তাড়া?

সে আবারো বলল, আমি যাই।

যাই যাই করছেন কেন? কিছুক্ষণ গল্প করুন। না-কি পুলিশ আপনাকে ফলো করছে?

কেউ ফলো করছে না।

একটা কথা শুধু বলে যান, ভাইয়াও কি আপনার মতো একজন?

আমি যাই।

আচ্ছা যান।

আমি মাথা ঠিক রাখতে চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। গত পাঁচদিন ধরে ক্লাসে যাচ্ছি না। আমার কী হয়েছে জানতে চেয়ে একের পর এক টেলিফোন আসছে। সেইসব টেলিফোন ধরছে তস্তুরী বেগম। সে সবাইকে বলছে আফা সিলেটে গেছেন। তার বাবার সাথে। কবে আসবে কোনো ঠিক নাই।

তারা সবাই তস্তুরী বেগমের কথা মেনে নিয়েছে। একজন শুধু মানে নি। সে বলেছে— মৃন্ময়ী বাসাতেই আছে। আপনি তাকে দিন। অসম্ভব জরুরি। টেলিফোন আমাকে ধরতে হলো। স্যার টেলিফোন করেছেন। তিনি স্বাভাবিক গলায় বললেন, কী হয়েছে?

আমি বললাম, কিছু হয় নি। শরীর খারাপ। জ্বর। মনে হচ্ছে ডেঙ্গু হয়েছে। সব লক্ষণ ডেঙ্গুর মতো।

আমি কি ডেঙ্গু রোগীকে দেখতে আসতে পারি?

এখন পারেন না। আমি একটা ধাঁধার সমাধান করার চেষ্টা করছি। যদি সমাধান করে ফেলতে পারি তাহলে আসতে পারেন। খুবই কঠিন ধাধা।

ধাঁধাটা আমাকেও বলে। এসো আমরা দুজনে মিলে সমাধান বের করি।

এই ধাঁধা আমাকেই সমাধান করতে হবে।

মৃন্ময়ী তুমি কেমন আছ বলে তো? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি খুব ভালো নেই।

ঠিক ধরেছেন। আমি ভালো নেই।

তুমি চাইলে ভালো থাকার একটা মন্ত্র আমি তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি।

শিখিয়ে দিন।

সব কিছু সহজভাবে নেবে। যা হবার তাই হচ্ছে। বেশিও হচ্ছে না, কমও হচ্ছে না। নিয়তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

যে নিয়তিবাদী না, তার পক্ষে এমন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া কি সম্ভব?

নিয়তিবাদী হয়ে যাও।

আপনি কি নিয়তিবাদী?

হ্যাঁ। মৃন্ময়ী শোনো, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। তুমি আমাকে সুযোগ দাও।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, নিয়তিতে যদি লেখা থাকে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন তাহলে সাহায্য করবেন। যদি এ রকম কিছু লেখা না থাকে তাহলে সাহায্য করতে পারবেন না। স্যার আমি রাখি?

আরেকটু কথা বলো।

নিয়তি বলছে এখন আর কথা হবে না।

আমি টেলিফোন রেখে দিলাম।

আমি আকাশ দেখছি। আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়ে আছে। যে-কোনো সময় বৃষ্টি নামবে। বর্ষার নবধারা জলে স্নান করতে পারলে ভালো হতো। মনের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে যেত। সেটা সম্ভব না। আমার জ্বর খুব বেড়েছে। তস্তুরী বেগম খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাথায় পানি ঢালতে চায়। ডাক্তার ডাকতে চায়। আমি পাত্তা দিচ্ছি না। জ্বর গায়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করছি।

একটু আগে বাবা সিলেট থেকে টেলিফোন করেছিলেন। উদ্বিগ্ন গলায় বলেছেন–মৃ আজকের খবরের কাগজ দেখেছিস।

আমি সহজ গলায় বললাম, দেখেছি।

বাবা বললেন, আমি প্লেনের সেকেন্ড ফ্লাইট ধরে ঢাকায় চলে আসছি। কোনো রকম দুশ্চিন্তা করবি না।

আচ্ছা।

খবরটা পড়ে তুই কি বেশি রকম আপসেট হয়েছিস? তোর গলা এরকম শুনাচ্ছে কেন?

বাবা আমার জ্বর। জ্বরের কারণে গলা এরকম হয়ে গেছে।

আমি দুপুরের মধ্যে চলে আসব। তুই মোটেও আপসেট হবি না।

আমি আপসেট না বাবা। আমি নিয়তীবাদী হয়ে গেছি। নিয়তিবাদী মানুষ আপসেট হয় না। বাবা এই ঘটনাটি তুমি ঘটিয়েছ? এন্ড গেমে জয়লাভ হয়েছে।

বাবা বিরক্ত গলায় বললেন, কী আজেবাজে কথা বলছিস? এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠিয়ে দে। তোর মা কোথায়?

মার নাটকের শুটিং চলছে বাবা। তিনি শুটিং-এ গেছেন।

খবরের কাগজ কি তোর মা দেখেছে?

দেখেছেন হয়তো। মা নিয়মিত কাগজ পড়েন।

তারপরেও শুটিং-এ চলে গেল!

খবরের কাগজের খবরটা তোমার জন্যে যতটা গুরুত্বপূর্ণ মার জন্যে হয়ত ততটা নাবাবা টেলিফোন রেখে দেই? কথা বলতে পারছি না। ব্যথায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

তস্তুরী বেগম হঠাৎ ঘরে ঢুকে উত্তেজিত গলায় বলল, আফা আজহার চাচা মারা গেছেন খবর জানেন?

খবরের কাগজের প্রথম পাতায় আজহার চাচার একটা ছবি ছাপা হয়েছে। ছবির ক্যাপশান– সন্ত্রাসীর গুলিতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর মৃত্যু। হত্যাকাণ্ডের দীর্ঘ বর্ণনাও আছে। দিনে দুপুরে একটা সুন্দর চেহারার ছেলে কী কাজের কথা বলে তার অফিস ঘরে ঢুকেছে। সবার সামনে পর পর তিনবার গুলি করেছে। ছেলেটার চেহারা সুন্দর। মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল। পুলিশ সন্দেহ করছে হত্যাকাণ্ডের নায়কের নাম টুলু। সে পেশাদার খুনি।

ছবিতে আজহার চাচা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। একটা ছেলে তাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। কী পবিত্র দৃশ্য।

তস্তুরী বেগম বলল, আজহার চাচাজীর ছেলে আসছে আফা। আফনের সাথে দেখা করতে চায়। তারে কি চইল্যা যাইতে বলব? সে খুবই কানতেছে।

তাকে ড্রয়িংরুমে বসাও। তাকে বলে আমি আসছি।

আসছি বলেও আমি শুয়ে আছি। তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। আকাশ জোড়া মেঘ! কী সুন্দর মেঘমালা। কখন বৃষ্টি নামবে?